মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া
HUMAN PHYSIOLOGY : RESPIRATION AND BREATHING

৫ অধ্যায়

দেহের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজের জন্য শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি খাদ্যের মাধ্যমে সঞ্চিত হয়। প্রতিটি সজীব কোষেই খাদ্যবস্তুর জারণ হয়ে থাকে। তবে খাদ্যে শক্তি স্থিতিশক্তি হিসেবে থাকে। কোষের অভ্যন্তরে অক্সিজেনের সহায়তায় খাদ্য জারিত হয়ে কোষস্থ স্থিতিশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। জীব এই তাপশক্তিকেই ব্যবহার করে। যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোষের অভ্যন্তরে সরল খাদ্যবস্তু (গ্লুকোজ) অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে কোষস্থ স্থিতিশক্তি তাপশক্তিরূপে মুক্ত হয় এবং বিপাকীয় বর্জ্য হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি হয় তাকে শ্বসন (respiration) বলে। যে তন্ত্রের মাধ্যমে শ্বসন সম্পাদিত হয় তাকে শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System) বলা হয়।

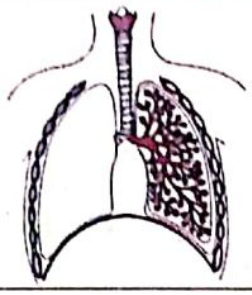
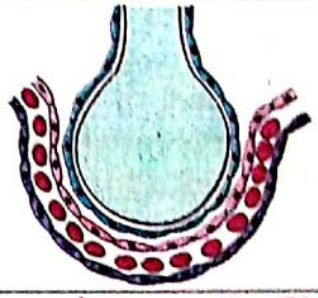
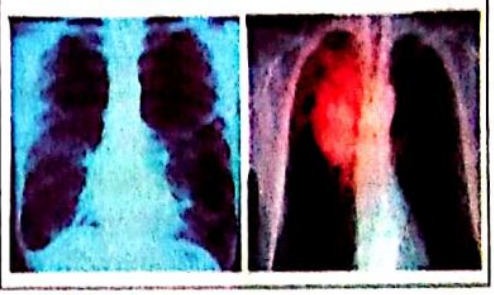

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে–

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা-১০)
১. মানুষের শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠনের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে। ২. ব্যবহারিক ○ ফুসফুসের অনুচ্ছেদ শনাক্ত ও চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ৩. মানুষের প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম Ventilation Mechanism) ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ৪. রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. শ্বসনে রঞ্জকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. শ্বাসনালির রোগ সংক্রমণের কারণ, লক্ষণ এবং প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. একজন ধূমপায়ী ও একজন অধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের তুলনা করতে পারবে। ৮. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা হিসেবে মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।	• শ্বসন তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও কাজ • ব্যবহারিক ○ ফুসফুসের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ • প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম ও নিয়ন্ত্রণ • গ্যাসীয় পরিবহন ○ অক্সিজেন ○ কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন • শ্বাসরঞ্জক • শ্বসননালির সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার ○ সাইনুসাইটিস ○ ওটিটিস মিডিয়া • ফুসফুসের এক্স-রের তুলনা ○ ধূমপায়ী মানুষের ○ অধূমপায়ী মানুষের • কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের উদ্দেশ্য ○ মুখ হতে মুখের সাহায্যে

৫.১ মানুষের শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System of Human)

দেহের যে অঙ্গগুলো শ্বসন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তা হলো নাসিকা, নাসাগলবিল, ল্যারিংক্স, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাস এবং ফুসফুস। এদের সমন্বয়ে মানুষের শ্বসনতন্ত্র গঠিত। শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশের O_2 দেহে প্রবেশ করে এবং CO_2 ত্যাগ করে। শ্বসনতন্ত্রের পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন অংশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যথা– **বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল, বায়ু পরিবহন অঞ্চল** ও **শ্বসন অঞ্চল**। নিম্নে শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ বর্ণনা করা হলো।

(ক) বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল (ঊর্ধ্ব শ্বসন নালি)

১। নাসিকা (Nostril) : মুখমণ্ডলের সম্মুখভাগে মুখছিদ্রের ঠিক উপরে একটি ত্রিকোনাকার ফাঁপা অঙ্গকে নাসিকা বলে। ইহা অস্থি, তরুণাস্থি, যোজককলা ও পেশি নিয়ে গঠিত। নাসিকার সম্মুখ ছিদ্রকে সম্মুখ নাসাছিদ্র এবং এর পরের অংশের নাম ভেস্টিবিউল (vestibule) এবং ভেস্টিবিউলের পরে ভেতরের ফাঁপা গহ্বরকে নাসাগহ্বর বলে।

নাসাগহ্বর একটি উল্লম্ব ব্যবধায়ক দ্বারা বাম ও ডান নাসাপথে বিভক্ত। নাসাপথ নাসাগলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত। এর অন্তঃপ্রাচীরে সিলিয়াযুক্ত এপিথেলিয়াম, মিউকাস পর্দা, রক্তবাহিকা, ঘ্রাণ সংবেদী কোষ এবং অসংখ্য লোম ও তৈলগ্রন্থি বিদ্যমান থাকে।

কাজ : (i) নাসিকা বায়ু প্রবেশে সাহায্য করে। (ii) যেসব ধূলিকণা বা রোগজীবাণু বায়ুতে থাকে তা লোম ও মিউকাসের কারণে ছাঁকনির মতো কাজ করে। (iii) অলফ্যাক্টরি কোষ ঘ্রাণ উদ্দীপনা গ্রহণে সহায়তা করে। (iv) নাসারন্ধ্র অতিক্রমকারী বাতাস কিছুটা গরম ও আর্দ্র হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে ফলে শুষ্ক ও শীতল বাতাস ফুসফুসের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। (v) আমরা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধময় দ্রব্য বা গ্যাসের উপস্থিতিও নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে পাই।

২। নাসাগলবিল (Naso-pharynx) : নাসাগহ্বরের পেছন দিকে স্বরযন্ত্রের উপরিভাগের প্রশস্ত অংশকে নাসাগলবিল বলে। এটি কোয়ানা (choana) বা পশ্চাৎ নাসাছিদ্র নামক দুটি ছিদ্রের মাধ্যমে নাসাগহ্বরের সাথে যুক্ত। নাসাগলবিল একটি অভিন্ন গমনপথ যেখান থেকে খাদ্যনালি ও শ্বাসনালি দুটি ভিন্ন পথে নিচের দিকে নেমে যায়। নাসাগলবিলের পশ্চাৎভাগের উপরের দিকে ছোট একটি জিহ্বার মতো মাংসপিণ্ড থাকে, একে **আলজিহ্বা** (uvula) বলে।

কাজ : (i) বায়ু নাসাগলবিল অতিক্রম করে ল্যারিংক্সে প্রবেশ করে। (ii) খাদ্য গ্রহণকালে এপিগ্লটিস (epiglottis) ট্রাকিয়ার প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়, ফলে খাদ্যকণা শ্বাসনালিতে প্রবেশ না করে খাদ্যনালিতে প্রবেশ করে।

৩। ল্যারিংক্স বা স্বরযন্ত্র (Larynx or Voice box) : মুখবিহ্বর ও ট্রাকিয়ার সংযোগকারী হচ্ছে ল্যারিংক্স। ল্যারিংক্স একটি ছোট পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট নলাকার অংশ, যা গলদেশে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ গ্রীবা কশেরুকার তলে হাইওয়েড অস্থির (Hyoid bone) ঠিক নিচে অবস্থিত। **বয়ঃসন্ধিকালের পর স্বরনালি স্ত্রীদের চেয়ে পুরুষদের বেশি স্থূল হয়। তাই পুরুষের গলার স্বর অপেক্ষাকৃত ভারী হয়।** এটি ছোট ছোট খণ্ডবিশিষ্ট তরুণাস্থি নির্মিত অংশ। এগুলোর মধ্যে থাইরয়েড তরুণাস্থি সবচেয়ে বড় এবং পুরুষের গলার সামনে উঁচু হয়ে ওঠে। এ অংশকে **অ্যাডাম অ্যাপল** (adam apple) বলা হয়। ল্যারিংক্সটি মুখবিবরে একটি ছিদ্র দিয়ে উন্মুক্ত। এই ছিদ্রটিকে **গ্লটিস** (glottis) বলে। গ্লটিসের মুখে এপিগ্লটিস নামক ঢাকনার মতো অংশ থাকে। **ল্যারিংক্স গহ্বরে ছয়টি স্বররজ্জু বা ভোকাল কর্ড** (vocal cord) থাকে। ভোকাল কর্ড পেশির সঙ্গে সংযুক্ত। পেশি ভোকাল কর্ডের টান বা টেনসন (tension) নিয়ন্ত্রণ করে। টানটান অবস্থায় বায়ু দ্বারা ভোকাল কর্ড কম্পিত হয়ে শব্দ উৎপন্ন করে। ভোকাল কর্ডের টান এবং এদের মধ্যে দূরত্বের উপর স্বরের পিচ (pitch) নির্ভর করে।

কাজ : (i) খাদ্য গ্রহণের সময় গ্লটিসটি এপিগ্লটিস নামক ঢাকনার মাধ্যমে বন্ধ থাকে। (ii) স্বরযন্ত্রে শব্দ উৎপন্ন হয়।

(খ) বায়ু পরিবহন অঞ্চল (নিম্ন শ্বসন নালি)

৪। শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া (Trachea) : ল্যারিংক্সের শেষ ভাগে গ্রীবার মাধ্যমে বক্ষগহ্বর পর্যন্ত যে নালি রয়েছে তাকে ট্রাকিয়া বা **শ্বাসনালি** বলে। এটি প্রায় ১২ সেন্টিমিটার লম্বা ও ২ সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট হয়। এর প্রাচীর ১৬-২০টি 'C' আকৃতিবিশিষ্ট কার্টিলেজ নির্মিত বলয় (ট্রাকিয়াল রিং) দ্বারা গঠিত। তন্তুময় কলা দিয়ে বলয়গুলো পরস্পর সংযুক্ত থাকে বলে শ্বাসনালি কখনো চুপসে যায় না। এর বহিঃপ্রাচীর যোজক আবরণী দ্বারা এবং অন্তঃপ্রাচীর সিলিয়াযুক্ত মিউকাস পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে।

কাজ : (i) ট্রাকিয়া চুপসে যায় না বলে অতি সহজে এর মধ্য দিয়ে বায়ু চলাচল করতে পারে।
(ii) এর অন্তঃপ্রাচীরে সিলিয়া অবাঞ্ছিত বস্তু (যেমন- ধূলিকণা, খাদ্যকণা, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি) প্রবেশ রোধ করে।

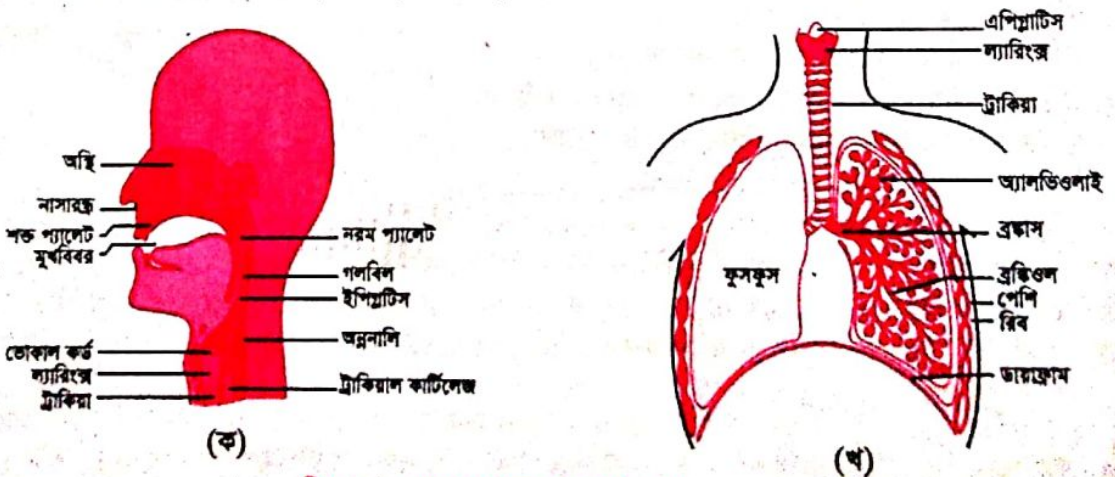

চিত্র ৫.১ : মানুষের শ্বসনতন্ত্র (ক ও খ)

৫। **ব্রঙ্কাস** (Bronchus) : বক্ষগহ্বরে ট্রাকিয়ার শেষ অংশ চতুর্থ ও পঞ্চম থোরাসিক কশেরুকার লেভেলে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যে নালি গঠন করে তাকে **ব্রঙ্কাস** (বহুবচনে bronchi- ব্রঙ্কাই) বা ক্রোমনালি বলে। প্রতি পাশের ব্রঙ্কাস বাম ও ডান ফুসফুসে প্রবেশ করে পুনরায় ফুসফুসে কতগুলো শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এদেরকে ব্রঙ্কিওল (bronchiole) বলে। ব্রঙ্কিওল দু'ধরনের, যথা– প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল ও শ্বসন ব্রঙ্কিওল। ব্রঙ্কাসের প্রাচীরও তরুণাস্থি বলয় ও রোমযুক্ত ঝিল্লি দ্বারা গঠিত। ব্রঙ্কিওলগুলো তরুণাস্থিবিহীন।

কাজ : ব্রঙ্কাই দিয়ে বায়ু বাম ও ডান ফুসফুসে প্রবেশ করে। অর্থাৎ ব্রঙ্কাসদ্বয় ট্রাকিয়া থেকে ফুসফুসে O_2 যুক্ত বাতাস পরিবহন করে ও ফুসফুস থেকে CO_2 যুক্ত বাতাস ট্রাকিয়ায় নিয়ে যায়।

(গ) শ্বসন অঞ্চল

৬। **ফুসফুস** (Lung) : মানুষের দুটি ফুসফুস বক্ষীয় গহ্বরে ডায়াফ্রামের উপরে হৃৎপিণ্ডের দু'পাশে অবস্থিত। এটি হালকা গোলাপি রঙের স্পঞ্জের মতো নরম অঙ্গ। ফুসফুস দুই স্তরবিশিষ্ট **প্লিউরা** (pleura) পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। ভেতরের পর্দাকে **ভিসেরাল** ও বাইরের পর্দাকে **প্যারাটাইল** প্লিউরা বলে। দুই স্তরের মাঝে **সেরাস ফ্লুইড** বা **প্লিউরাল ফ্লুইড** (serous fluid or pleural fluid) নামক তরল পদার্থ থাকে, যা ফুসফুসকে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে। প্রতিটি ফুসফুসের যে স্থান দিয়ে ব্রঙ্কাস, রক্তনালি ও লসিকানালি প্রবেশ করে তাকে **হাইলাম** (hilum) বলে। ব্রঙ্কাস, রক্তনালি ধমনিও শিরা ও লসিকানালি ঘন যোজক কলা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে **ফুসফুসীয় মূল** (pulmonary root) গঠন করে যার মাধ্যমে ফুসফুস ঝুলে থাকে।

মানুষের বাম ও ডান দুটি ফুসফুস রয়েছে। বাম ফুসফুসটি আকারে ছোট এবং (ওজন ৫৬৫ গ্রাম) ডান ফুসফুসটি আকারে বড় (ওজন ৬২৫ গ্রাম)। এ দুটি ফুসফুস আবার খাঁজের সাহায্যে ডান ও বাম খণ্ডে বিভক্ত। মানব ফুসফুসে মোট পাঁচটি খণ্ড বা **লোব** (lobe) বিদ্যমান। এর মধ্যে ডান ফুসফুস **তিন লোব** (সুপিরিয়র লোব, মিডল লোব ও ইনফিরিয়র লোব) বিশিষ্ট এবং বাম ফুসফুস **দুই লোব** (সুপিরিয়র লোব ও ইনফিরিয়র লোব) বিশিষ্ট। প্রতিটি লোব আবার **লোবিউল** (lobules) নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। ডান ফুসফুসে ১০টি এবং বাম ফুসফুসে ৮টি লোবিউল থাকে। লোবিউলগুলো প্রকৃতপক্ষে ফুসফুসীয় একক **অ্যালভিওলাই** (একবচন-অ্যালভিওলাস alveolus, বহুবচন অ্যালভিওলাই-alveoli)-এর সমষ্টি। তাছাড়া বাম ফুসফুসে একটি **হৃদখাঁজ** (cardiac notch) থাকে যা হৃৎপিণ্ডকে ধারণ করে। অ্যালভিওলাই-এর চারপাশে থাকে পালমোনারি ধমনি ও শিরার কৈশিক জালিকা। **অ্যালভিওলাই**-এর প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা হওয়ায় রক্ত ও ফুসফুস মধ্যস্থ গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে ব্যাপন ঘটে। ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রতিটি ব্রঙ্কাস প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও টারসিয়ারি শাখায় বিভক্ত হয়। টারসিয়ারি ব্রঙ্কাস বার বার বিভক্ত হয়ে যেসব সূক্ষ্ম নালিকা সৃষ্টি করে তাদেরকে **প্রান্তীয়** বা **টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল** (terminal bronchiole) বলে, যা এক একটি লোবিউলে প্রবেশ করে।

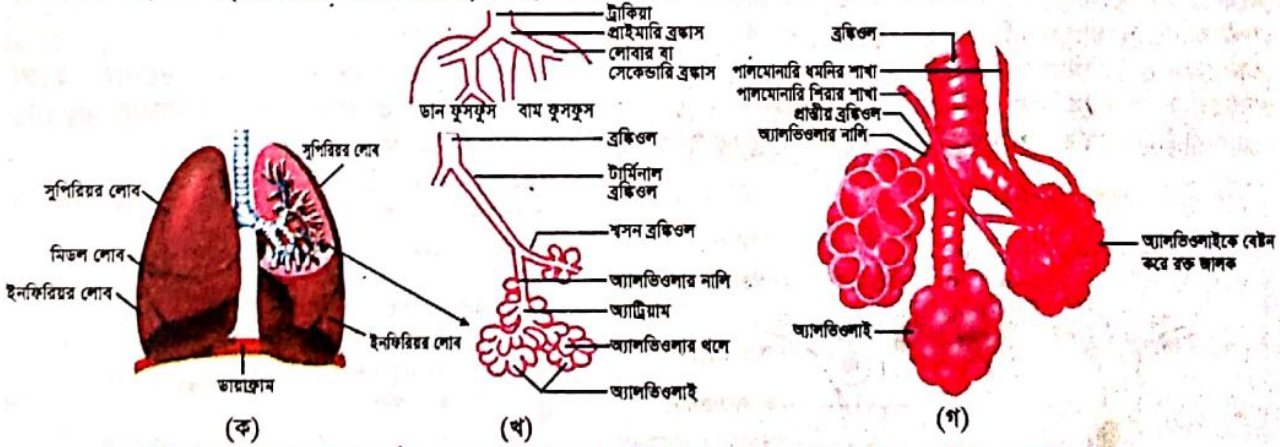

চিত্র ৫.২ : ফুসফুসের গঠন : ক. ফুসফুস, খ. ব্রঙ্কিয়াল বৃক্ষ ও গ. রক্তজালক বেষ্টিত অ্যালভিওলাই

লোবিউলের ভেতরে প্রতিটি টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল আবার **শ্বসন ব্রঙ্কিওল** (respiratory bronchioles), **অ্যালভিওলার নালি** (alveolar duct), অ্যাট্রিয়াম, **অ্যালভিওলার থলি** (alveolar sac) হয়ে পরিশেষে **অ্যালভিওলাসে** (alveolus, pl. alveoli) উন্মুক্ত হয়। প্রাইমারি ব্রঙ্কাস থেকে শুরু করে অ্যালভিওলাস পর্যন্ত ফুসফুসের গঠনচিত্র দেখতে অনেকটা বৃক্ষের মতো বলে একে **শ্বসন বৃক্ষ** বা **ব্রঙ্কিয়াল বৃক্ষ** (respiratory tree) বলে। অ্যালভিওলার নালি এবং অ্যালভিওলাই সরল আঁইশাকার বা স্কায়ামাস এপিথেলিয়াম (squamous epithelium) দ্বারা আবৃত থাকে। **শ্বসনতন্ত্রে বায়ু প্রবাহের গতিপথ হলো :**

ট্রাকিয়া → ব্রঙ্কাস → ব্রঙ্কিওল → অ্যালভিওলার নালি → অ্যালভিওলার থলি → অ্যালভিওলাস

কাজ : ফুসফুস মানুষের প্রধান শ্বসন অঙ্গ। ফুসফুসের অ্যালভিওলাসে ব্যাপন প্রক্রিয়া শ্বসন গ্যাস O_2 ও CO_2 এর গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে। এতে ট্রাকিয়ার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত থাকে। এটিতে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন, ক্যাট ও কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষণ ঘটে। ফুসফুস দেহ থেকে শ্বসন বর্জ্য CO_2 নিষ্কাশন করে। ফুসফুস দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, পানিসাম্যতা রক্ষা করে ও শব্দ সৃষ্টি করে।

ট্রাকিওল এবং ব্রঙ্কিওলের মধ্যে পার্থক্য

ট্রাকিওল	ব্রঙ্কিওল
ঘাসফড়িংসহ অন্যান্য কীটপতঙ্গের শ্বসনতন্ত্রের অংশ।	মানুষের শ্বসনতন্ত্রের অংশ।
আন্তঃকোষীয় নালি যা কোষের গভীরে বিস্তৃত।	আন্তঃকোষীয় নালি নয় এবং ফুসফুসে অবস্থিত।
ট্রাকিওলের প্রান্তদেশ বন্ধ এবং কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।	পুনরায় শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অ্যালভিওলার থলিতে সমাপ্তি ঘটে।
প্রান্তদেশে তরল পদার্থ থাকে।	তরল পদার্থ অনুপস্থিত।
কোষ অভ্যন্তরে O_2 সরবরাহ করে।	অ্যালভিওলার থলি পর্যন্ত O_2 পরিবহন করে।

মাছের ফুলকা এবং মানুষের ফুসফুসের মধ্যে পার্থক্য

ফুলকা (মাছের)	ফুসফুস (মানুষের)
বহু জলজ প্রাণীসহ মাছের শ্বসন অঙ্গ।	প্রধানত স্থলজ মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্বসন অঙ্গ।
ফুলকা সাধারণত দেখতে চ্যাপ্টা ও খণ্ডিত।	ফুসফুস দেখতে বেলুনের মতো।
ফুলকা নির্দিষ্ট ফুলকা প্রকোষ্ঠে অবস্থান করে।	ফুসফুস বক্ষ গহ্বরে অবস্থান করে।
প্রতিটি ফুলকা দু'সারি গিল ফিলামেন্ট দিয়ে গঠিত এবং প্রচুর রক্তজালক সমৃদ্ধ।	প্রতিটি ফুসফুস অসংখ্য অ্যালভিওলাই নিয়ে গঠিত।
সহজেই পানিতে দ্রবীভূত O_2 গ্রহণ করতে পারে কারণ ফুলকা রক্তজালকসমৃদ্ধ।	অ্যালভিওলাইয়ের কৈশিকনালির মাধ্যমে বায়ু থেকে গৃহীত O_2 রক্তে প্রবেশ করে।

অ্যালভিওলাসের গঠন (Structure of Alveolus)

অ্যালভিওলাস হলো ফুসফুসের মধ্যে অবস্থিত স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা আবৃত ও কৈশিকজালিকাসমৃদ্ধ অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির বুদবুদ (bubble) সদৃশ বায়ুথলি বিশেষ। একে ফুসফুসের গঠনগত ও কার্যগত এককও বলা হয়। এরা গ্যাস বিনিময়ের তল (gas exchange surface) গঠন করে। বয়সের সাথে ফুসফুসের অ্যালভিওলাসের সংখ্যার তারতম্য ঘটে। যেমন- নবজাতক শিশুর ফুসফুসে এর সংখ্যা ২০ মিলিয়ন, ৮ বছরের শিশুর ৩০০ মিলিয়ন এবং একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দুটি ফুসফুসে প্রায় ৭০০ মিলিয়নের (৭০ কোটি) অধিক অ্যালভিওলাই থাকে যা প্রায় ৭০-৯০ বর্গমিটার (কারও মতে ১১,৮০০ বর্গ সেন্টিমিটার) আয়তনের তল জুড়ে অবস্থান করে। অ্যালভিওলাসের ব্যাস ০.২ মি.মি. এবং প্রাচীর মাত্র ০.০০০১ মি.মি. (= ০.১ মাইক্রোমিটার) পুরু। এদের বাইরের দিকে প্রচুর কৈশিকজালক নিবিড়ভাবে অবস্থান করে। পালমোনারি ধমনি থেকে এদের উৎপত্তি ঘটে এবং পুনরায় মিলে পালমোনারি শিরা গঠন করে। প্রতিটি অ্যালভিওলাসের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা, চ্যাপ্টাকৃতির স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। ফলে অতি সহজেই গ্যাসের ব্যাপন ঘটতে পারে। তাছাড়া প্রাচীরে কোলাজেন ও ইলাস্টিন নামক স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকে। স্থিতিস্থাপক তন্তুর কারণে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকালে অ্যালভিওলাস সহজেই প্রসারিত হতে পারে এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারে। অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে **অ্যালভিওলাস ম্যাক্রোফেজ** (alveolar macrophage) নামক ফ্যাগোসাইটিক শ্বেতকণিকা থাকে যা অণুজীবসহ বহিরাগত বস্তু ধ্বংস করে।

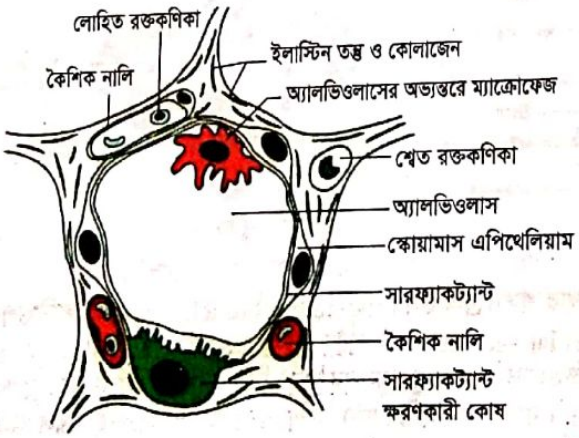

চিত্র ৫.৩ক : অ্যালভিওলাসের গঠন (প্রস্থচ্ছেদ)

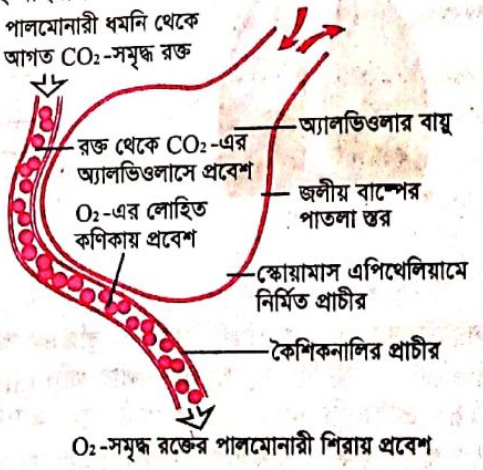

চিত্র ৫.৩খ : অ্যালভিওলাসের মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময়

অ্যালভিওলাস প্রাচীরে কিছু বিশেষ কোষ (সেপ্টাল কোষ-septal cell) থাকে, যারা প্রাচীরের অন্তঃতলে ডিটারজেন্ট (detergent) এর অনুরূপ **সারফেকট্যান্ট** (surfactant) নামক লিপোপ্রটিন রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। **এটি ফসফোলিপিড, নিউট্রাললিপিড (প্রধানত কোলেস্টেরল), বিভিন্ন আয়ন ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত।** এ পদার্থ অ্যালভিওলাস-প্রাচীরের তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান (surface tension) কমিয়ে দিয়ে ফুসফুসকে সহজে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে সহায়তা করে, ফলে গ্যাসীয় (O_2 ও CO_2) বিনিময় সহজ হয়। এছাড়া এটি অ্যালভিওলাসে আগত জীবাণুকে (ব্যাকটেরিয়া) ধ্বংস করে।

সারফেকট্যান্টবিহীন অ্যালভিওলাস তথা ফুসফুস যথাযথ কাজ করতে পারে না। ২৩ সপ্তাহ (৫ মাস) বয়সের পূর্বে কোনো ভ্রূণে সারফেকট্যান্ট ক্ষরণ শুরু হয় না। এই কারণে ২৪ সপ্তাহের আগেই মানবভ্রূণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী গণ্য করা হয় না। অনেক দেশে তাই এ সময়কাল পর্যন্ত গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া হয়। অনেক সময় সারফেকট্যান্ট তৈরি না হওয়ায় শিশুদের শ্বসন কষ্টজনিত রোগ **RDS** (Respiratory Distress Syndrome) হয়। প্রশ্বাস ক্রিয়ার অক্ষমতার জন্য অনেক সময় শিশু মারা যায়। অ্যালভিওলাসের মাধ্যমে গ্যাসের বিনিময় ঘটে।

অ্যালভিওলাসে গ্যাসীয় আদান-প্রদান

প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস এই দুটি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলের বায়ু প্রথমে ফুসফুসের বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাইতে প্রবেশ করে। সেই কারণে অ্যালভিওলাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বায়ুথলির চারদিকে অবস্থিত পালমোনারি শিরার রক্তজালিকায় অবস্থিত অক্সিজেনের চেয়ে বেশি থাকে। আবার পালমোনারি ধমনি দিয়ে আনীত রক্তে CO_2 এর পরিমাণ বেশি থাকে। ফলে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে O_2 ও CO_2 এর মধ্যে গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে। এই গ্যাসীয় আদান-প্রদানই হলো **বহিঃশ্বসন**। এই গ্যাসীয় আদান-প্রদান পার্শ্ব চাপের ওপর নির্ভরশীল।

শ্বসনতন্ত্রের কাজ

১। **শ্বসন গ্যাসের বিনিময়** : শ্বাসক্রিয়ার সময় পরিবেশের অক্সিজেন (O_2) রক্তে মিশে এবং রক্ত থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়।

২। **পানি সাম্যতা** : নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ৪০০-৬০০ মিলিলিটার পানি দেহ থেকে বের হয়ে যায়। এতে দেহের পানির সাম্যতা বজায় রাখতে সহায়তা হয়।

৩। **তাপ নিয়ন্ত্রণ** : নিঃশ্বাসের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) এর সঙ্গে দেহের কিছু তাপ নির্গত হয়ে দেহের তাপমাত্রা বজায় থাকতে সহায়তা করে।

৪। **সংশ্লেষণ** : ফুসফুসে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষণ ঘটে।

৫। **এসিড ও ক্ষারের সাম্যতা** : নিঃশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হওয়ায় pH নিয়ন্ত্রণে সহায়তা হয়।

৬। **শক্তি উৎপাদনের ভূমিকা** : শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে গৃহীত অক্সিজেন (O_2) কোষীয় শ্বসনে ব্যবহৃত হয় এবং শক্তি উৎপন্ন হয়।

৭। **অন্যান্য কাজ** : এটি শ্বসন ছাড়াও অন্যান্য অনেক কাজ সম্পাদন করে। যথা– (ক) ফুসফুসীয় কলা সেরোটোনিন ও হিস্টামিন সংরক্ষণ ও বিমুক্ত করে। (খ) নরঅ্যাড্রিনালিন ও অ্যাড্রিনালিনকে নিষ্ক্রিয় করে। (গ) ইমিউনোগ্লোবিন ক্ষরণ করে, এটি অ্যানজিওটেনসিন-I কে অ্যানজিওটেনসিন-II এ রূপান্তরিত করে। (ঘ) ফুসফুসীয় কলা ব্রাডিকিনিন ও প্রোস্টাগ্লান্ডিন সংশ্লেষ ও দেহ হতে অপসারণ করে। এছাড়াও শব্দ উৎপন্ন করে, হোমিও স্টেসিস (homeostasis) বজায় রাখে, উদ্বায়ী গ্যাস (যেমন- ক্লোরোফর্ম, ইথার, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি) নিষ্কাশন করে এবং দূষিত পদার্থ প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে।

❑ **কাজ** : (i) মানব শ্বসনতন্ত্রের ক্ষুদ্রতম এককের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা কর। (ii) মানবদেহের বক্ষগহ্বরের একটি বায়ুকুঠুরির গঠন বর্ণনা কর।

শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গসমূহের নাম এবং কাজ

অঙ্গ	প্রধান কাজ
১। নাসিকা	নাসিকা বায়ু প্রবেশে সাহায্য করে। নাসিকার নাসারন্ধ্র অতিক্রমকারী বাতাস কিছুটা গরম ও আর্দ্র হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে ফলে শুষ্ক ও শীতল বাতাস ফুসফুসের কোনো ক্ষতি করতে পারে না।
২। নাসাগহ্বর	আগত (incoming) বায়ুকে ফিল্টার, গরম ও সিক্ত করে। নাসাগলবিলে বায়ু প্রবেশের জন্য পথ হিসেবে কাজ করে।
৩। নাসাগলবিল	নাক এবং ল্যারিংক্সের মধ্যে বায়ুপ্রবাহের জন্য এবং মুখ থেকে গলবিলে খাদ্যের চলনের জন্য করিডোর (passageway) হিসেবে কাজ করে।
৪। ল্যারিংক্স (স্বরথলি)	নাসাগলবিল ও শ্বাসনালির অবশিষ্ট অংশে বায়ু চলনের জন্য করিডোর প্রদান করে। শব্দ তৈরি করে। ট্রাকিয়াকে বহিরাগত বস্তু থেকে রক্ষা করে।
৫। ট্রাকিয়া	বক্ষগহ্বর থেকে বায়ু যাতায়াতের করিডোর (passageway) প্রদান করে। সিলিয়া দ্বারা বহিরাগত বস্তুকে আটকায় এবং বহিষ্কার করে।
৬। ব্রঙ্কাই	ফুসফুসে বায়ুর যাতায়াতের জন্য করিডোর (passageway) প্রদান করে। বায়ু ফিল্টার করে।
৭। ব্রঙ্কিওল	অ্যালভিওলাসে বায়ুর যাতায়াতের জন্য করিডোর প্রদান করে।
৮। অ্যালভিওলাই	শ্বসন গ্যাস (O_2 এবং CO_2) বিনিময়ের স্থান। ফুসফুসের গাঠনিক ও কার্যকরী একক।
৯। ফুসফুস	প্রধান শ্বসন অঙ্গ। রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং পরিবেশের মধ্যে O_2 ও CO_2 এর বিনিময় ঘটায়।
১০। প্লিউরা	ফুসফুসের বহিঃপৃষ্ঠকে রক্ষা করে। কামরায় বিভক্ত করে (compartmentalize) এবং লুব্রিকেট (lubricate) করে।

ব্যবহারিক

পরীক্ষণের নাম : ফুসফুসের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ব্যবহারিক অংশ ৫৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

CamScanner

৫.২ প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম (Ventilation Mechanism)

যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে অক্সিজেন (O_2) সমৃদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) সমৃদ্ধ বায়ু ফুসফুস থেকে বের হয়ে যায় তাকে বা ব্রিফিং **শ্বাসক্রিয়া** (breathing) বা **শ্বসন কৌশল** বলে। প্রকৃতপক্ষে এটি **বহিঃশ্বসন** প্রক্রিয়া। বক্ষগহ্বরের আয়তনের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বক্ষগহ্বর সম্প্রসারিত হলে ফুসফুসেরও সম্প্রসারণ ঘটে এবং বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে। বিপরীতক্রমে বক্ষগহ্বর সংকুচিত হলে ফুসফুসেরও সংকোচন ঘটে, ফলে ফুসফুসীয় চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। বায়ু তখন ফুসফুস থেকে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। দুই ধরনের পেশির ক্রিয়ায় বক্ষগহ্বরের আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। পেশিগুলো হলো বক্ষ ও উদর গহ্বরের মাঝে **ডায়াফ্রাম** (diaphram) এবং পর্শুকাসমূহের (ribs) ফাঁকে অবস্থিত **ইন্টারকোস্টাল পেশি** (intercoastal muscle)।

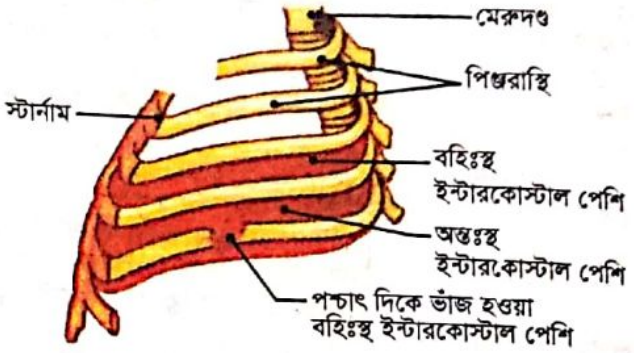

চিত্র ৫.৪ক : ইন্টারকোস্টাল পেশি

শ্বাসক্রিয়া দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়। যথা : **শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ।**

(ক) শ্বাস গ্রহণ বা প্রশ্বাস (Inhalation/Inspiration) : **শ্বাসকার্যের যে পর্যায়ে বায়ুমণ্ডলের O_2 সমৃদ্ধ বায়ু ফুসফুসের অ্যালভিওলাসে প্রবেশ করে, তাকে প্রশ্বাস বলে।** প্রশ্বাসের সময় বক্ষপিঞ্জরের পর্শুকাগুলোর (ribs) মধ্যবর্তী ইন্টারকোস্টাল পেশি সংকুচিত হয় ফলে বক্ষপিঞ্জর উপরের দিকে বা সামনের দিকে প্রসারিত হয়। এতে বক্ষগহ্বরের আয়তন বেড়ে যায়। অন্যদিকে ডায়াফ্রামের পেশি সংকুচিত হয় ফলে ডায়াফ্রাম নিচে নেমে আসে এবং দৈর্ঘ্য বরাবর বক্ষগহ্বর বৃদ্ধি পায়। এভাবে বক্ষগহ্বর প্রসারণের ফলে **অন্তঃপ্লিউরাল** (intrapleural) ও **অন্তঃবক্ষীয়** (intrathoracic) চাপ হ্রাস পায় এবং ফুসফুস প্রসারিত হয়। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বৃদ্ধি পাওয়ায় বক্ষ গহ্বরের আয়তন বেড়ে যায়। ফলে ভেতরের চাপ ও পরিবেশের চাপের তুলনায় কম হওয়ার কারণে চাপের সমতা রক্ষার জন্য নাক ও ট্রাকিয়ার মাধ্যমে ফুসফুসে O_2 যুক্ত বায়ু প্রবেশ করে।

ফুসফুসে O_2 যুক্ত বায়ুর চলন :

বায়ু → বহিঃনাসারন্ধ্র → নাসাগহ্বর → নাসাপথ → নাসাগলবিল → গ্লটিস (শ্বাসছিদ্র) → ল্যারিংক্স → ট্রাকিয়া → ব্রঙ্কাই → ব্রঙ্কিওল → অ্যালভিওলার নালি → অ্যালভিওলার থলি → অ্যালভিওলাই

(খ) শ্বাসত্যাগ বা নিঃশ্বাস (Exhalation/Expiration) : **শ্বাসকার্যের যে পর্যায়ে ফুসফুসের অ্যালভিওলাস হতে CO_2 সমৃদ্ধ বায়ু দেহের বাইরে তথা বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়, তাকে নিঃশ্বাস বলে।** প্রশ্বাসের পর পরই নিঃশ্বাস প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এটি একটি নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া। নিঃশ্বাসকালে বহিঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশি এবং ডায়াফ্রাম শিথিল হয়। উদরীয় পেশিগুলোর চাপে ডায়াফ্রাম ধনুকের মতো বেঁকে বক্ষগহ্বরের আয়তন কমিয়ে দেয় এবং এতে **অন্তঃবক্ষীয় ও অন্তঃফুসফুসীয়** বায়ুচাপ বাহিরের বায়ুচাপ হতে অনেক বেড়ে যায়। ফলে ফুসফুস থেকে CO_2 যুক্ত বায়ু নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে যায়।

ফুসফুস থেকে CO_2 যুক্ত বায়ু নির্গমন :

বায়ু → অ্যালভিওলাই → অ্যালভিওলার থলি → অ্যালভিওলার নালি → ব্রঙ্কিওল → ব্রঙ্কাই → ট্রাকিয়া → ল্যারিংক্স → গ্লটিস → নাসালগবিল → নাসাপথ → নাসাগহ্বর → বহিঃনাসারন্ধ্র → দেহের বাইরে

শ্বসন একটি ছন্দময় প্রক্রিয়া। পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষ বিশ্রামকালে এ প্রক্রিয়া প্রতি মিনিটে ১৪-১৮ বার এবং নবজাত শিশুতে ৪০ বার সংঘটিত হয়। তবে ব্যায়াম বা অন্য কারণে শ্বসনের হার দ্রুত হয় বলে উদরীয় পেশিও তখন শ্বসন কাজে যোগ দেয়।

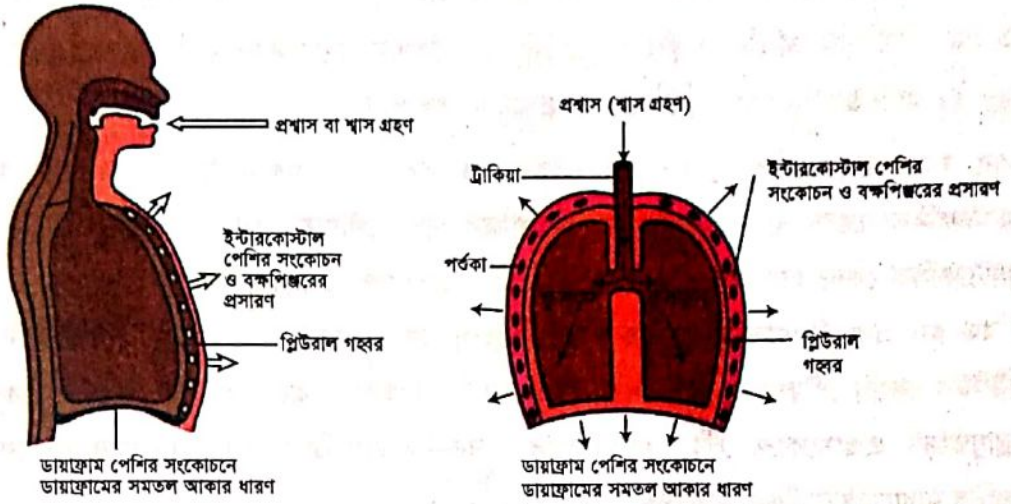

ফুসফুসের বায়ুর প্রবেশ (প্রশ্বাস)

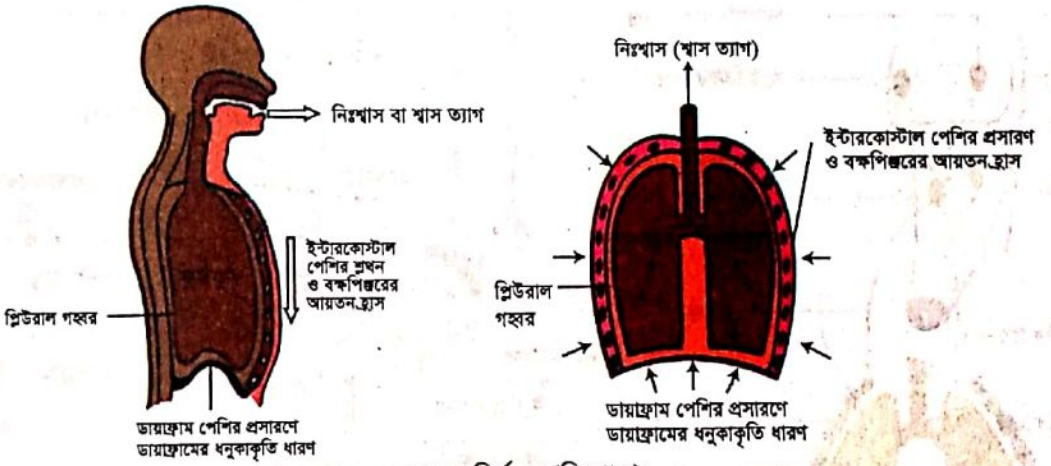

ফুসফুসে বায়ু নির্গমন (নিঃশ্বাস)

চিত্র ৫.৪খ : প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম

প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (Ventilation/Breathing Control)

মানবদেহের প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস অর্থাৎ শ্বাস প্রক্রিয়া দু'ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। যথা– **স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ** এবং **রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ**।

(ক) স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ (Nervous control) : মস্তিষ্কের শ্বাসকেন্দ্র, শ্বসন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিদ্যমান প্রতিবর্তী ক্রিয়া এবং অন্যান্য কতিপয় স্নায়বিক উদ্দীপনা শ্বাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

১। **শ্বাসকেন্দ্র** (Respiratory center) : প্রধানত মস্তিষ্কে বিদ্যমান ৪টি কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন একগুচ্ছ স্নায়ু শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্কের **পনসের** (pons) পার্শ্বদেশে অবস্থিত একজোড়া স্নায়ুকেন্দ্র এবং **মেডুলা অবলংগাটার** (medulla oblongata) পার্শ্বদেশে অবস্থিত একজোড়া স্নায়ুকেন্দ্র প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এদেরকে **শ্বাসকেন্দ্র** বলে। পনসের পাশে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রদ্বয় যথাক্রমে **নিউমোট্যাকসিক** (pneumotaxic) ও **অ্যানিউস্টিক** (apneustic) স্নায়ুকেন্দ্র নামে পরিচিত। অন্যদিকে মেডুলার পাশে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রদ্বয় যথাক্রমে **প্রশ্বাসকেন্দ্র** (inspiratory centre) ও **নিঃশ্বাসকেন্দ্র** (expiratory centre) নামে পরিচিত। শ্বাসকেন্দ্র বা স্নায়ুকেন্দ্রসমূহ শ্বসন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে স্নায়ুজালক দ্বারা যুক্ত থাকে। তাছাড়া স্নায়ুকেন্দ্রসমূহ রক্তে CO_2 ও H^+ আয়নের মাত্রার প্রতি বিশেষ সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করে। স্নায়ুকেন্দ্রগুলোর মধ্যে প্রশ্বাসকেন্দ্র ও নিঃশ্বাসকেন্দ্রের কার্যকারিতা পরস্পর বিপরীতমুখী অর্থাৎ এদের একটি উদ্দীপিত হলে অপরটি অবদমিত হয়ে পড়ে। এ জন্য প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস ক্রিয়া ছন্দময় আবর্তনে ঘটে থাকে।

CamScanner

রক্তে CO_2 এর উপস্থিতিতে **অ্যানিউস্টিক কেন্দ্র** উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনা প্রশ্বাসকেন্দ্রে পৌছালে সেখান থেকে যথাক্রমে **ফ্রেনিক স্নায়ু** ও **ইন্টারকোস্টাল স্নায়ুর** মাধ্যমে উদ্দীপনা ডায়াফ্রাম ও ইন্টারকোস্টাল পেশিতে পৌছায় এবং তখনই প্রশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। একই সময়ে স্নায়ুতাড়না বা স্নায়ু উদ্দীপনা প্রশ্বাসকেন্দ্র থেকে নিউমোট্যাকসিক কেন্দ্রেও প্রেরিত হয়। **নিউমোট্যাকসিক কেন্দ্রের** স্নায়ুতাড়না এবং ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে ফুসফুসে বায়ুস্ফীতির উদ্দীপনা (প্রশ্বাস গ্রহণজনিত) অ্যানিউস্টিক কেন্দ্রে পৌছালে তা প্রশমিত হয়ে পড়ে।

এর ফলে প্রশ্বাসকেন্দ্রে স্নায়ুতাড়না প্রেরণ বন্ধ হয় এবং প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। একই সময়ে নিউমোট্যাকসিক কেন্দ্র হতে স্নায়ুতাড়না নিঃশ্বাসকেন্দ্রেও পৌছায়, ফলে নিঃশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। এভাবে নিউমোট্যাকসিক কেন্দ্র হতে একই সঙ্গে স্নায়ুতাড়না প্রশ্বাসকেন্দ্র ও নিঃশ্বাসকেন্দ্রে পৌছানোতে একই সময়ে প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয় এবং নিঃশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। নিঃশ্বাস ক্রিয়া চলাকালে ফুসফুস সংকোচনজনিত কোনো উদ্দীপনা অ্যানিউস্টিক কেন্দ্রে পৌছায় না বলে সেটির অবদমন ক্রিয়া অপসৃত হয়। তাই অ্যানিউস্টিক কেন্দ্র পুনরায় উদ্দীপিত হয়ে স্নায়ুতাড়না প্রশ্বাসকেন্দ্রে প্রেরণ করে। ফলে, পুনরায় প্রশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। আর এভাবে পর্যায়ক্রমে ঘটনার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শ্বাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

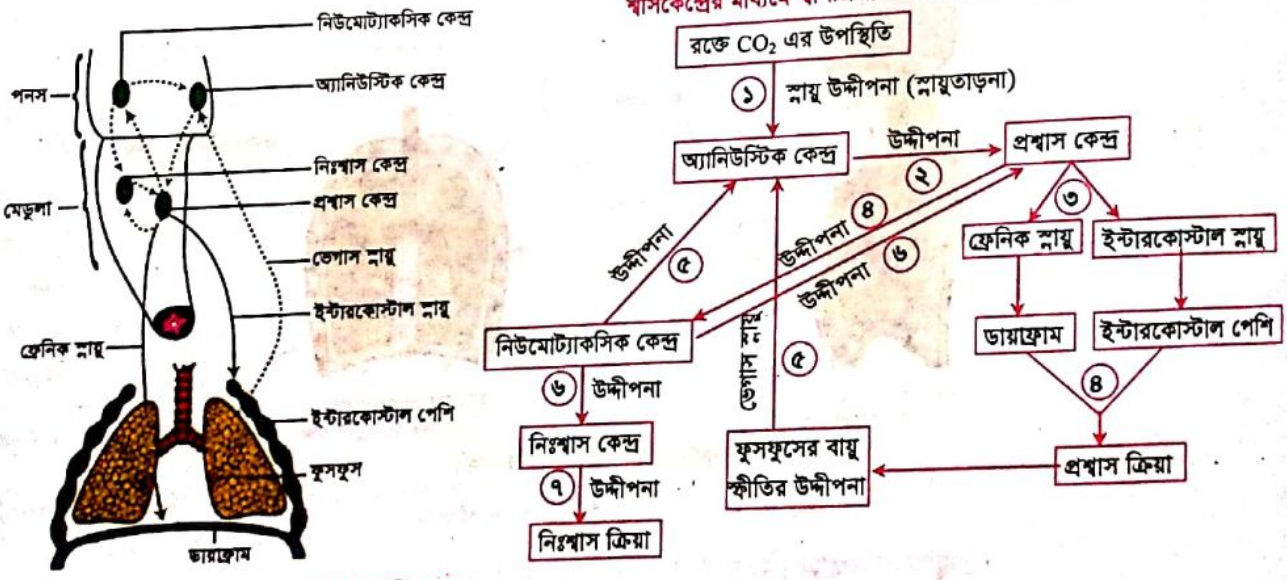

চিত্র ৫.৫ : শ্বাসকেন্দ্রের মাধ্যমে শ্বাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ

২। প্রতিবর্তী বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) : শ্বাস ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সংঘটিত কয়েকটি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মাধ্যমে শ্বসন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেমন–

- প্রশ্বাস ক্রিয়ায় ফুসফুস বায়ুপূর্ণ হলে ফুসফুসের প্রাচীরের টান গ্রাহক কোষসমূহ উদ্দীপিত হয়। এ উদ্দীপনা ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে অ্যানিউস্টিক স্নায়ুকেন্দ্রে প্রেরণ করে এর কার্যক্রম প্রশমিত করে, ফলে প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়। নিঃশ্বাস ক্রিয়ার সময় ফুসফুস সংকুচিত থাকে বলে টান গ্রাহক কোষসমূহ উদ্দীপিত হয় না, তাই ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে কোনো স্নায়ুতাড়না পরিবাহিত হয় না। এতে অ্যানিউস্টিক স্নায়ুকেন্দ্র কার্যকারিতা ফিরে পেয়ে প্রশ্বাস ক্রিয়া ঘটায়। ফুসফুসের এরূপ প্রসারণ ও সংকোচনের ফলে সৃষ্ট প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে **হেরিং-ব্রয়ার প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (Hering-Breur reflex) বলে। এর দ্বারা শ্বাসক্রিয়ার ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয়।

- নাসিকাগহ্বরের প্রাচীরের মিউকাস পর্দায় উদ্দীপনাজনিত স্নায়ুতাড়না অলফ্যাক্টরি স্নায়ুর (olfactory nerve) মাধ্যমে হাঁচি (sneezing) প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায় এবং শ্বাস ক্রিয়ার পরিবর্তন আনে।
- ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালিতে বহিরাগত কোনো পদার্থ প্রবেশ করলে এর মিউকাস পর্দা উদ্দীপিত হয়ে ভেগাস স্নায়ুর (vagus nerve) মাধ্যমে কাশি (caughing) প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায় এবং শ্বাস ক্রিয়ার পরিবর্তন আনে।
- খাদ্য গলাধঃকরণ বাধাগ্রস্ত হলে গলবিল গাত্রের উদ্দীপনাজনিত স্নায়ুতাড়না গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ুর (glossopharyngeal nerve) মাধ্যমে গলবিলীয় বা গ্যাগ প্রতিবর্তী (pharyngeal or gag reflex) ক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়।
- অনেকসময় দেহের ত্বক, ভিসেরা, পেশি, অস্থিসন্ধি ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত স্নায়ুতাড়না প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মাধ্যমে শ্বাস ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

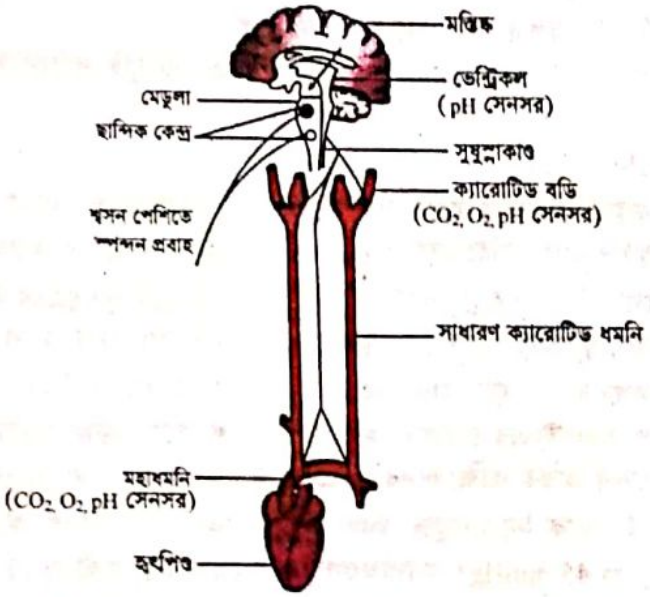

চিত্র ৫.৬ : শ্বসনের রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ

৩. **অন্যান্য স্নায়বিক উদ্দীপনা** (Others nervous stimulation) : সেরিব্রাল কর্টেক্স, মধ্যমস্তিষ্ক, হাইপোথ্যালামাস ইত্যাদি স্থানে গৃহীত স্নায়ুতাড়নাও অনেক ক্ষেত্রে শ্বাস ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে। সেরিব্রাল কর্টেক্সের যেসব স্থান কথা বলা, ঘ্রাণ গ্রহণ, খাদ্য চর্বণ ও গলাধঃকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট সেসব স্নায়ুকেন্দ্র অনেকসময় শ্বাস ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটায়। যেমন– কথা বলার সময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ক্রিয়ার পরই দ্রুত প্রশ্বাস ক্রিয়া ঘটায়। হাইপোথ্যালামাসের আবেগজনিত স্নায়ুতাড়না শ্বাস ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। দেহের যে কোনো স্থান থেকে উদ্ভূত যন্ত্রণাদায়ক স্নায়ুতাড়ানা শ্বাস ক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করে। কিন্তু অধিক যন্ত্রণাজনিত স্নায়ুতাড়না অনেকসময় শ্বাস ক্রিয়াকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়।

(খ) রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ (Chemical control) : শ্বাসগতি নিয়ন্ত্রিত হয় রক্তের এবং সেরিব্রোস্পাইনাল তরলের (Cerebro Spinal Fluid-CSF) CO_2 লেভেলের ওপর। মস্তিষ্ক, অ্যাওর্টিক আর্চ, অ্যাওর্টিক বডিজ এবং ক্যারোটিড সাইনাসে অবস্থিত কেমোরিসেপ্টরগুলো রক্তের CO_2, pH এবং অক্সিজেন লেভেল শনাক্ত করে এবং মস্তিষ্কের শ্বাসকেন্দ্রে বা ছান্দিক কেন্দ্রে (rythmic centre) প্রেরণ করে। শ্বাসকেন্দ্র শ্বাসপেশিতে স্নায়ুস্পন্দন (nerve impulse) পাঠায়, যা শ্বাসগতিকে দ্রুত বা মন্থর করে CO_2 ও O_2-কে স্বাভাবিক লেভেলে নিয়ে আসে। ফলে শ্বাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

❑ **কাজ** : (i) মানুষের প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস কার্যক্রমটি বিশ্লেষণ কর। (ii) বায়ুকুঠুরির ভেন্টিলেশন কৌশলটি ব্যাখ্যা কর। (iii) সিগারেটের ধোঁয়া আমাদের দেহে প্রবেশের যান্ত্রিক কৌশল বর্ণনা কর। (iv) মানুষের এবং মাছের শ্বসন কৌশল কি একইরকম? যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ। (v) মানুষের প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস মস্তিষ্কের মেডুলা অবলংগাটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়–বিশ্লেষণ কর।

৫.৩ শ্বসনের শারীরবৃত্ত (Physiology of Respiration)

শ্বসন একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় জীব পরিবেশ থেকে O_2 গ্রহণ করে কোষস্থ খাদ্যকে জারিত করে খাদ্যের স্থিতিশক্তিকে তাপ ও গতিশক্তিকে রূপান্তরিত ও মুক্ত করে এবং CO_2 ও পানি দেহ থেকে বের করে দেয়। শ্বসনের শারীরবৃত্তকে তিনটি শিরোনামে আলোচনা করা যায়। যথা– (১) গ্যাসীয় আদান-প্রদান, (২) রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস (O_2 ও CO_2) পরিবহন ও (৩) কোষে খাদ্যবস্তুর জারণ বা কোষীয় শ্বসন। শ্বসনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটির রেখাচিত্র–

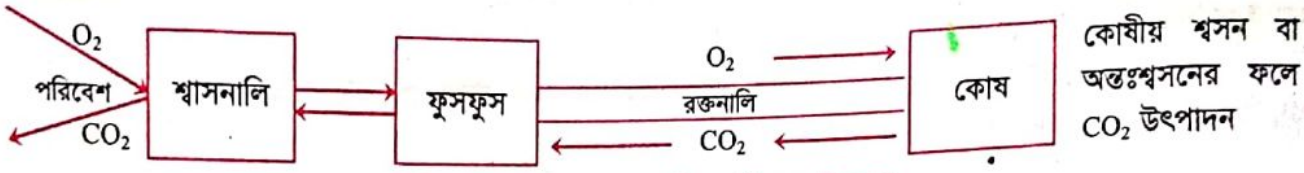

চিত্র ৫.৭ক : শ্বসনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার চিত্ররূপ

১। গ্যাসীয় আদান-প্রদান (Exchange of Gases) : শ্বসন প্রক্রিয়াটি দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। যথা– **বহিঃশ্বসন** ও **অন্তঃশ্বসন**।

(ক) বহিঃশ্বসন (External respiration)

ফুসফুসের বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাসের বায়ুর সঙ্গে ফুসফুসের রক্তজালকের মধ্যে যে গ্যাসীয় (O_2 ও CO_2) আদান-প্রদান হয় তাকে **বহিঃশ্বসন** বলে। বহিঃশ্বসনের দুটি পর্যায়, যেমন– প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস।

প্রশ্বাস (inspiration) হলো পরিবেশের O_2 যুক্ত বায়ু নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে ফুসফুসের অ্যালভিওলাসে প্রেরণ করে।

নিঃশ্বাস (expiration) হলো ফুসফুস থেকে CO_2 যুক্ত বায়ু নাসারন্ধ্র পথে দেহ থেকে বের করে দেয়।

বহিঃশ্বসন প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের O_2 যুক্ত বায়ু প্রথমে ফুসফুসের অ্যালভিওলাই-এ আসে। অ্যালভিওলাই থেকে অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অ্যালভিওলাই-এর রক্তজালকের রক্তে প্রবেশ করে। অ্যালভিওলাই-এর অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ (P_{O_2} = 104 mmHg) রক্তজালকের রক্তের অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ অপেক্ষা (P_{O_2} = 95 mmHg) বেশি হওয়ায় অক্সিজেন উচ্চচাপযুক্ত অঞ্চল অ্যালভিওলাই থেকে নিম্নচাপযুক্ত অঞ্চল রক্তজালকের রক্তে প্রবেশ করে। অন্যদিকে, রক্তজালকের রক্তের CO_2-এর পার্শ্বচাপ (P_{CO_2} = 45 mmHg) অ্যালভিওলাই-এর CO_2-এর পার্শ্বচাপ (P_{CO_2} = 40 mmHg) অপেক্ষা বেশি হওয়ায় CO_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তজালকের রক্ত থেকে অ্যালভিওলাই-এ প্রবেশ করে।

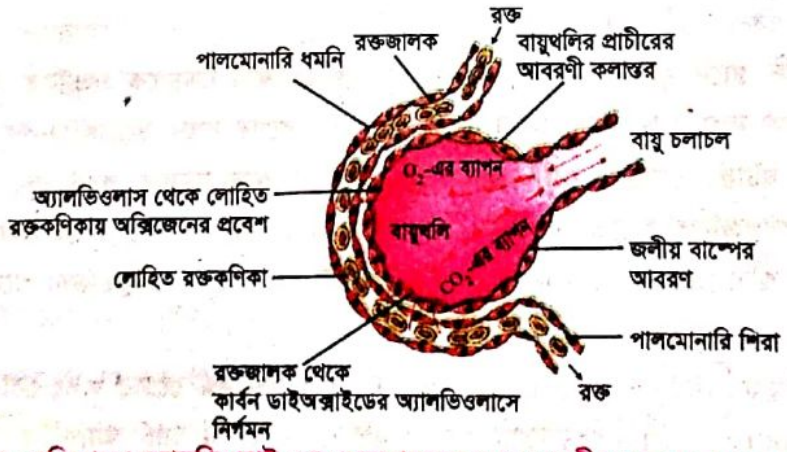

চিত্র ৫.৭খ : বহিঃশ্বসন-অ্যালভিওলাই এবং রক্তজালকের মধ্যে গ্যাসীয় আদান-প্রদানের চিত্ররূপ

চারটি প্রভাবক শ্বসন গ্যাস আদান-প্রদানকে প্রভাবিত করে, যেমন–

- **শ্বসনক্ষেত্রের আয়তন, পুরুত্ব ও গঠন।**
- **অ্যালভিওলাসে O_2 ও CO_2-এর চাপ।**
- **O_2 ও CO_2-এর দ্রাবণ ও ব্যাপন ক্ষমতা এবং**
- **অ্যালভিওলাস ও রক্তে বিদ্যমান গ্যাসের শারীরবৃত্তীয় সম্পর্ক।**

কাজ : ফুসফুসের গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

(খ) অন্তঃশ্বসন (Internal respiration) : যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রক্তের মাধ্যমে O_2 দেহের কলাকোষে প্রবেশ করে কোষস্থ খাদ্যের সঙ্গে বিক্রিয়া করে CO_2, পানি ও শক্তি উৎপন্ন করে তাকে **অন্তঃশ্বসন** বলে।
অন্তঃশ্বসনের বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 38ADP + 38Pi \xrightarrow[\text{এনজাইম}]{\text{বিভিন্ন}} 6CO_2 + 6\,H_2O + 38ATP\ (\text{শক্তি})$$

ধমনি রক্ত দিয়ে বাহিত অক্সিজেন রক্তজালক থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কলারসের মাধ্যমে কলাকোষে প্রবেশ করে। এই সময় রক্তজালকের রক্তের O_2-এর পার্শ্বচাপ ($P_{O_2} = 95$ mmHg) কলাকোষের অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ ($P_{O_2} = 40$ mmHg) অপেক্ষা বেশি হওয়ায় অক্সিজেন রক্তজালক থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রথমে কলারসে এবং পরে কলাকোষে প্রবেশ করে। অপরদিকে, বিপাকে উৎপন্ন CO_2 কলাকোষ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কলারসের মাধ্যমে রক্তজালকের রক্তে প্রবেশ করে। এইসময় কলাকোষের CO_2-এর পার্শ্বচাপ ($P_{CO_2} = 45$ mmHg) রক্তজালকের CO_2-এর পার্শ্বচাপ ($P_{CO_2} = 40$ mmHg) অপেক্ষা বেশি হওয়ায় CO_2 কলাকোষ থেকে রক্তজালকের রক্তে প্রবেশ করে।

বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	বহিঃশ্বসন	অন্তঃশ্বসন
১। প্রকৃতি	ভৌত প্রক্রিয়া।	জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া।
২। ক্রিয়াস্থল	কোষের বাইরে অর্থাৎ ফুসফুস।	কোষ অভ্যন্তর অর্থাৎ কোষ ও রক্ত।
৩। ক্রিয়ার পদ্ধতি	পরিবেশ থেকে O_2 শ্বসনাঙ্গে প্রবেশ করে এবং CO_2 শ্বসনাঙ্গ থেকে বাইরের পরিবেশে মুক্ত হয়।	কোষ মধ্যস্থ খাদ্যসার O_2 দ্বারা জারিত হয়ে শক্তি, পানি ও CO_2 তৈরি করে।
৪। এনজাইমের ভূমিকা	নেই।	আছে।
৫। শক্তি	শক্তি উৎপন্ন হয় না।	নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়
৬। প্রধান উপ-পর্যায়	শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ।	গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস চক্র ও গ্যাস পরিবহন।
৭। সীমাবদ্ধতা	শুধু প্রাণীর শ্বসনাঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।	জীবদেহের (উদ্ভিদ এবং প্রাণী) সকল সজীব কোষে সংঘটিত হয়।

২। রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস (O_2 ও CO_2) পরিবহন (Transportation of gases by Blood)

জীবনধারণের জন্য শ্বসন অপরিহার্য। জীবের শ্বসনের জন্য অক্সিজেন (O_2) প্রয়োজন হয়। O_2 এর উপস্থিতিতে কোষ মধ্যস্থ খাদ্যবস্তু জারিত হয়। আর কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) হলো শ্বসনজাত বর্জ্য। পরিবেশ থেকে জীব O_2 গ্রহণ করে এবং উৎপন্ন CO_2 পরিবেশে ত্যাগ করে। একে গ্যাস বিনিময় বলে। গ্যাস পরিবহনে রক্তের **শ্বাসরঞ্জকের** (যেমন– হিমোগ্লোবিন) ভূমিকাই মুখ্য। এটি একটি **অন্তঃশ্বসন** প্রক্রিয়া। মানুষের দেহের মধ্যে O_2 এবং CO_2 পরিবহন কৌশল আলোচনা করা হলো।

(ক) রক্ত কর্তৃক O_2 পরিবহন (Transportation of O_2 by blood)

কোষীয় শ্বসনে জারণ কার্যসম্পাদনের জন্য কোষে প্রচুর পরিমাণ O_2 এর প্রয়োজন হয়। এই O_2 ফুসফুস কর্তৃক বায়ুমণ্ডলে গৃহীত হয় এবং রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে দেহকোষে পৌঁছায়। রক্ত কর্তৃক O_2 দুই ভাবে পরিবাহিত হয়।

(১) ভৌত দ্রবণ রূপে : প্রায় ২% O_2 রক্তের প্লাজমায় দ্রবীভূত হয়ে ভৌত দ্রবণ রূপে পরিবাহিত হয়। অর্থাৎ প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ০.২ মিলিলিটার O_2 ভৌত দ্রবণ রূপে পরিবাহিত হয়। দ্রবীভূত অংশই রক্তে ১০০ মিলিমিটার পারদ চাপ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

(২) রাসায়নিক যৌগ রূপে : প্রায় ৯৮% O_2 রাসায়নিক যৌগ রূপে রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়। ফুসফুসের অ্যালভিওলাই থেকে ব্যাপনের মাধ্যমে O_2 কৈশিক জালিকার রক্তে প্রবেশ করে। O_2 রক্তে প্রবেশের পর লোহিত কণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অস্থায়ী যৌগ **অক্সিহিমোগ্লোবিন** (oxyhaemoglobin) গঠন করে। রক্তের pH মান বেশি থাকলে অক্সিজেনের প্রতি হিমোগ্লোবিনের আকর্ষণ বেশি থাকে।

CamScanner

হিমোগ্লোবিন O_2 পরিবহন করে বলে একে **শ্বাসরঞ্জক** (respiratory pigment) বলে। হিমোগ্লোবিন **হিম** নামক আয়রন রঞ্জক এবং **গ্লোবিন** নামক প্রোটিন নিয়ে গঠিত। উল্লেখ্য যে, হিমোগ্লোবিনকে Hb_4 বা Hb দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং প্রতি অণু হিমোগ্লোবিন চার অণু অক্সিজেন যুক্ত করতে পারে। O_2 এর সাথে হিমোগ্লোবিনের রাসায়নিক বিক্রিয়া উভমুখী।

$$Hb + O_2 \underset{\text{কম পরিমাণ } O_2}{\overset{\text{বেশি পরিমাণ } O_2}{\rightleftharpoons}} HbO_2 \text{ (অক্সিহিমোগ্লোবিন)}$$

অক্সিহিমোগ্লোবিন রক্ত দিয়ে বাহিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ এবং কলায় পৌঁছায়। অক্সিহিমোগ্লোবিন যখন কলাকোষের জালকে পৌঁছায় তখনই বিশ্লিষ্ট হয়। কলাকোষে গ্লুকোজের অবিরাম বিপাক ঘটতে থাকে। ফলে কোষে CO_2 উৎপাদন হতে থাকে এবং O_2-ও অবিরাম ব্যবহৃত হয়। ফলে কলারসে এবং কলাকোষে O_2 এর চাপ সবসময় কম থাকে এবং CO_2-এর চাপ জালক অপেক্ষা সর্বদা বেশি থাকে। সুতরাং কম O_2 চাপে অক্সিহিমোগ্লোবিন বিশ্লিষ্ট হয়ে O_2 মুক্ত করে। এই O_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তজালকের রক্ত থেকে প্রথমে কলারসে (tissue fluid) এবং পরে কোষে প্রবেশ করে।

(খ) রক্ত কর্তৃক CO_2 পরিবহন (Transportation of CO_2 by blood)

শর্করা জারণের সময় কোষে CO_2 সৃষ্টি হয়। এই CO_2 দেহের জন্য ক্ষতিকর। কোষ থেকে CO_2 রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌঁছায় এবং ফুসফুস থেকে বায়ুতে মুক্ত হয়। রক্তে সাধারণত ২৩-২৯ mEq (milliequivalents per liter) CO_2 থাকে। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে CO_2 রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়।

(১) ভৌত দ্রবণ রূপে

কিছু CO_2 (৫%) রক্তের প্লাজমার বা রক্তরসের H_2O এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড উৎপন্ন করে। এই কার্বনিক এসিড বিশেষ কোনো পরিবর্তন ছাড়াই প্লাজমার মাধ্যমে ফুসফুসে পরিবাহিত হয়।

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow \underset{\text{কার্বনিক এসিড}}{H_2CO_3}$$

প্রতি হাজার CO_2 অণুর মধ্যে মাত্র এক অণু H_2CO_3 রূপে দ্রবণে উপস্থিত থাকে। সুতরাং CO_2 এর খুব সামান্য অংশই H_2CO_3 রূপে পরিবাহিত হয়।

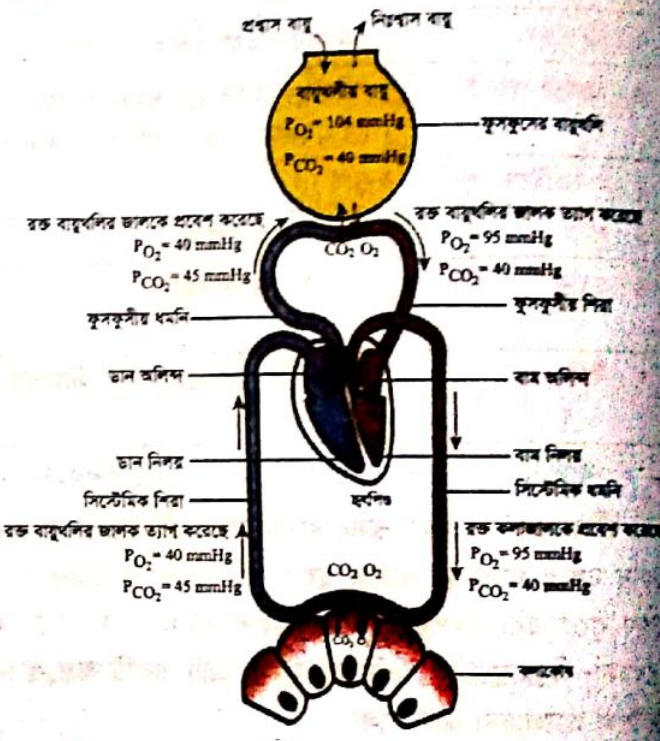

চিত্র ৫.৭গ : দেহের বিভিন্ন অংশে শ্বসন গ্যাস বিনিময়

(২) রাসায়নিক যৌগ রূপে :

(i) কার্বামিনো যৌগ রূপে : রক্তের প্লাজমায় আগত CO_2 এর কিছু অংশ (১০%) লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। লোহিত কণিকার মধ্যে যে হিমোগ্লোবিন থাকে তার প্রোটিন (গ্লোবিন) অংশের অ্যামিনো গ্রুপের ($-NH_2$) সঙ্গে CO_2 বিক্রিয়া করে **কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন** যৌগ গঠন করে ও ফুসফুসে আসার পর CO_2 মুক্ত করে।

$$CO_2 + HbNH_2 \longrightarrow \underset{\text{কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন}}{HbNHCOOH}$$

প্লাজমা বা রক্তরসে অবস্থিত CO_2 এর একাংশ প্রোটিন শ্রেণিভুক্ত অ্যামিনো গ্রুপের ($PrNH_2$) সঙ্গে যুক্ত হয়ে **কার্বামিনোপ্রোটিন** গঠন করে পরিবাহিত হয়।

$$CO_2 + Pr\,NH_2 \longrightarrow \underset{\text{কার্বামিনোপ্রোটিন}}{PrNHCOOH}$$

(ii) বাই-কার্বনেট যৌগ রূপে

৮৫% CO_2 বাই-কার্বনেট যৌগ রূপে রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়। CO_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ নামক এনজাইমের উপস্থিতিতে পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড (H_2CO_3) সৃষ্টি করে। এই কার্বনিক এসিডের অধিকাংশ ভেঙে H^+ ও HCO_3^- আয়নে পরিণত হয়।

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ}} \underset{\text{কার্বনিক এসিড}}{H_2CO_3}$$

$$H_2CO_3 \longrightarrow H^+ + HCO_3^-$$

HCO_3^- রক্তের লোহিত রক্তকণিকায় K^+ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পটাশিয়াম বাইকার্বনেট ($KHCO_3$) গঠন করে। কিছু HCO_3^- লোহিত রক্তকণিকা হতে বের হয়ে রক্তরসে চলে আসে এবং Na^+ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম বাইকার্বনেট ($NaHCO_3$) গঠন করে।

লোহিত রক্তকণিকায় : $K^+ + HCO_3^- \longrightarrow KHCO_3$

রক্তরসে : $Na^+ + HCO_3^- \longrightarrow NaHCO_3$

এভাবে সৃষ্ট $KHCO_3$ ও $NaHCO_3$ রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়। লোহিত রক্তকণিকা থেকে যতটি HCO_3^- রক্তরসে আসে ততটি Cl^- রক্তরস থেকে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। একে **ক্লোরাইড শিফট বিক্রিয়া বা হ্যামবার্জার বিক্রিয়া** (Chloride shift reaction or Hamburger's reaction) বলা হয়। লোহিত রক্তকণিকা থেকে বাইকার্বনেট আয়ন রক্তরসে প্রবেশ করার ফলে ভারসাম্য রক্ষার জন্য ক্লোরাইড আয়ন রক্তরস থেকে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। এর ফলে রক্তে অম্ল-ক্ষার (pH = 7.4) ভারসাম্য বজায় থাকে।

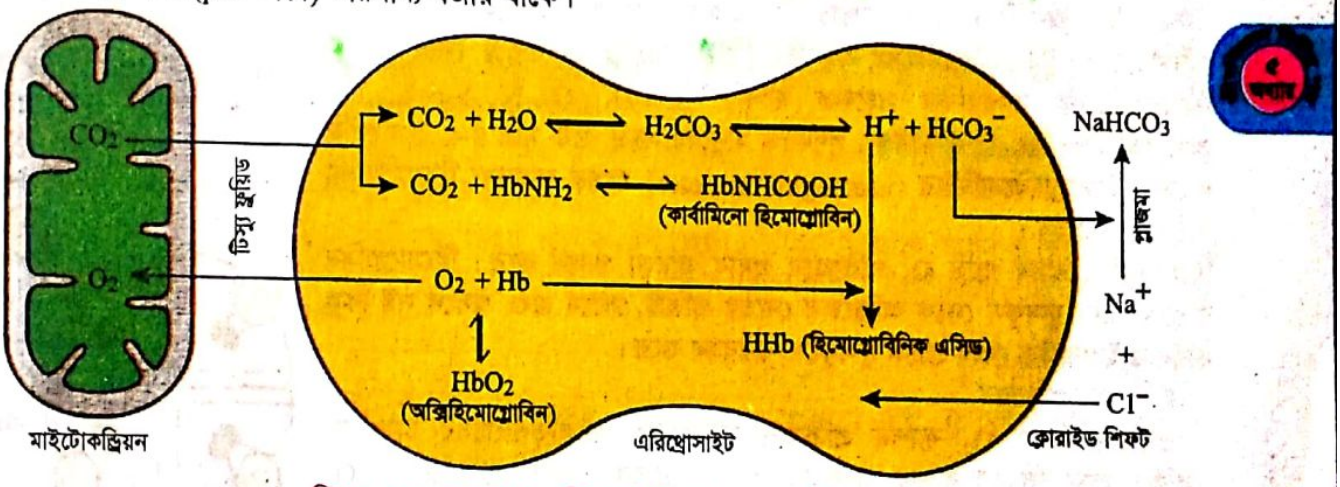

চিত্র ৫.৭ঘ : প্লাজমা ও এরিথ্রোসাইট দ্বারা CO_2 পরিবহন

(৩) কোষে খাদ্যবস্তুর জারণ (Oxidation of Food materials in Cell)

কোষে খাদ্যবস্তুর জারণ ক্রিয়া সংঘটিত হয়। সাধারণত শর্করা (গ্লুকোজ) জাতীয় খাদ্যের জারণ বেশি হয়। কোষের অভ্যন্তরে গ্লুকোজ O_2 দ্বারা জারিত হয়ে CO_2 ও শক্তি অর্থাৎ ATP উৎপাদন করে। এ প্রক্রিয়াটি চারটি ধাপে সংঘটিত হয়।

(i) গ্লাইকোলাইসিস : এটি কোষের সাইটোপ্লাজমের তরল অংশে সংঘটিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ ভেঙে দুই অণু পাইরুভিক এসিড উৎপন্ন করে।

$$\text{গ্লুকোজ} \xrightarrow{\text{এনজাইম}} \text{পাইরুভিক এসিড}$$

(ii) পাইরুভেট অক্সিডেশন : এটিও কোষের সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় পাইরুভিক এসিড কো-এনজাইমের (CoA) সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে **অ্যাসিটাইল CoA** গঠন করে।

পাইরুভিক এসিড + কো-এনজাইম (CoA) = অ্যাসিটাইল CoA

(iii) ক্রেবস চক্র : এটি মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে সংঘটিত হয়। এ চক্রে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যাসিটাইল CoA ও অক্সালো অ্যাসিটেট হতে ATP ও H^+ সৃষ্টি হয়।

CamScanner

(ঙ) ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম/চেইন (ETS/ETC) : এ ক্ষেত্রে H^+ থেকে ATP ও পানি সৃষ্টি হয়। খাদ্যবস্তু জারণের সময় প্রচুর পরিমাণে O_2 ব্যবহৃত হয় এবং CO_2 সৃষ্টি হয়।

শ্বসনিক হার বা শ্বসনিক কোশেন্ট (Respiration Quotient or RQ)

শ্বসন প্রক্রিয়ায় জীব যে পরিমাণ CO_2 ত্যাগ করে এবং যে পরিমাণ O_2 গ্রহণ করে তার অনুপাতকে শ্বসনিক হার বা শ্বসনিক কোশেন্ট বলে।

$$\text{শ্বসনিক হার (RQ)} = \frac{\text{নির্গত } CO_2 \text{ এর পরিমাণ}}{\text{গৃহীত } O_2 \text{ এর পরিমাণ}}$$

বিভিন্ন শ্বসনিক বস্তুর জন্য শ্বসনিক কোশেন্ট বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। শ্বসনিক বস্তু গ্লুকোজ হলে RQ এর মান ১ হয়। চর্বি জাতীয় পদার্থ শ্বসনিক বস্তু হলে RQ এর মান ১ এর কম হয়, কারণ চর্বি জাতীয় পদার্থ সম্পূর্ণ জারিত হতে অধিক পরিমাণ O_2 এর প্রয়োজন পড়ে। জৈব এসিডের RQ এর মান ১ এর বেশি হয়, কারণ জৈব এসিডে CO_2 এর পরিমাণ O_2 থেকে বেশি। প্রোটিনের RQ এর মান ১ এর কম হয়। মরুজ উদ্ভিদে RQ অত্যন্ত কম এমনকি শূন্য হতে পারে।

৫.৪ শ্বসনে শ্বাসরঞ্জকের ভূমিকা (Role of Respiratory Pigment During Respiration)

রক্তের যে অংশ দ্বারা শ্বসন গ্যাস, বিশেষ করে O_2 পরিবাহিত হয় তাকে **শ্বাসরঞ্জক** বলে। মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় বিদ্যমান লাল বর্ণের প্রোটিনধর্মী ভারী পদার্থ **হিমোগ্লোবিন** হলো **শ্বাসরঞ্জক**। হিমোগ্লোবিন এর বর্ণের জন্যই রক্ত লাল দেখায়। প্রতিটি হিমোগ্লোবিন অণু ৫% হিম (heme) নামক লৌহ ধারণকারী পিগমেন্ট এবং ৯৫% গ্লোবিন (globin) নামক পলিপেপটাইড প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত। এক অণু হিমোগ্লোবিন চারটি হিম এককে ও চারটি পেপটাইড শৃঙ্খল দ্বারা গঠিত। রক্তে হিম ও গ্লোবিনের অনুপাত ১:২৫। হিমের ৩৩.৩৩% লৌহ (Fe)। হিমোগ্লোবিনের রাসায়নিক সংকেত হলো– $(C_{712}H_{1130}O_{245}N_{214}S_2Fe)_4$, এর আণবিক ওজন ৬৪,৪৫০ ডাল্টন। পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমগ্র রক্তে মাত্র ৪-৫ গ্রাম লৌহ থাকে। হিমোগ্লোবিনোমিটার (haemoglobinometer) যন্ত্রের সাহায্যে হিমোগ্লোবিন পরিমাপ করা হয়।

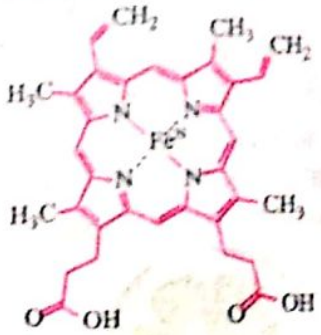

চিত্র ৫.৮ক : হিমোগ্লোবিনের গাঠনিক সংকেত

হিমোগ্লোবিন শ্বসন গ্যাস O_2 পরিবহনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। হিমোগ্লোবিন শ্বসনের জন্য ফুসফুস থেকে অক্সিজেন দেহের প্রতিটি কোষে এবং শ্বসনে সৃষ্ট কিছু কার্বন ডাইঅক্সাইড কোষ থেকে ফুসফুসে পরিবহন করে।

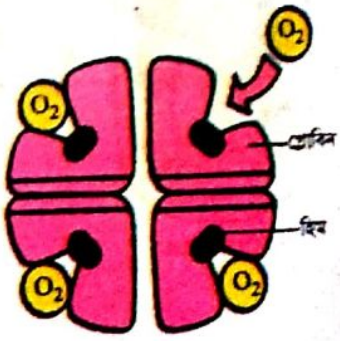

চিত্র ৫.৮খ : হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন সংবন্ধন

অক্সিজেন পরিবহন

প্রশ্বাসের সময় O_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের অ্যালভিওলাসের চারপাশে অবস্থিত রক্তজালিকার রক্তের প্লাজমায় আসে। প্লাজমা থেকে প্রায় ৯৮% O_2 হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে অস্থায়ী যৌগ অক্সিহিমোগ্লোবিন হিসেবে দেহকোষে পরিবাহিত হয়। দেহকোষের চারপাশে যেহেতু অক্সিজেনের পরিমাণ কম তাই অক্সিহিমোগ্লোবিন ভেঙে অক্সিজেন মুক্ত হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষে প্রবেশ করে।

$$Hb + O_2 \rightleftharpoons HbO_2$$

কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন

শ্বসনে সৃষ্ট কিছু CO_2 (১০%) লোহিত কণিকার মধ্যে যে হিমোগ্লোবিন থাকে তার প্রোটিন (গ্লোবিন) অংশের অ্যামিনো গ্রুপের ($-NH_2$) সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়। কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ কর্তৃক হৃৎপিণ্ড হয়ে পরিশোধনের জন্য ফুসফুসে গমন করে। ফুসফুসে আসার পর বিপরীতমুখী পরিবর্তন দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইড মুক্ত হয়।

$$CO_2 + HbNH_2 \longrightarrow \underset{\text{কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন}}{HbNHCOOH}$$

এই রাসায়নিক বিক্রিয়া এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে (০.০১ সেকেন্ডের কম) অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়।

কাজ : (i) হিমোগ্লোবিন শ্বসনে কী ভূমিকা পালন করে– ব্যাখ্যা কর। (ii) হিমোগ্লোবিন O_2 এবং CO_2 পরিবহনের মাধ্যমে দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– ব্যাখ্যা কর। (iii) মানুষের অন্তঃশ্বসনে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

৫.৫ শ্বসননালির সমস্যা, লক্ষণ এবং প্রতিকার
(Problems, Symptoms and Remedy of Respiratory Tract)

মানবদেহের জন্য সুস্থ অঙ্গতন্ত্র প্রয়োজন। বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে শ্বসনতন্ত্রের শ্বসননালি অন্যতম প্রধান অঙ্গ। ফুসফুস, শ্বসননালি, গলা বা সাইনাসের যেকোন ধরনের সংক্রমণকে **শ্বসননালির সংক্রমণ** (respiratory tract infections-RTI) বলে। কিন্তু এ শ্বসননালি প্রায়ই ভাইরাসে, মাঝে মধ্যে ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সচল দেহকে আধা-অচল করে দেয়। সাধারণ ঠান্ডা লাগা সবচেয়ে বড় ধরনের RTI জটিলতা।

এছাড়াও পরিবেশ দূষণ ও ধূমপানের কারণে শ্বসননালির বিশেষ ক্ষতি হয়ে থাকে। আমাদের শ্বসননালির গাত্রে সিলিয়েটেড কোষ ও মিউকাস কোষ নামক দু'ধরনের বিশেষ কোষ থাকে। এ কোষগুলো ধুলাবালি ও জীবাণু থেকে আমাদের ফুসফুসকে নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু ধূমপান ও পরিবেশ দূষণের কারণে এ কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে আমরা সহজেই রোগাক্রান্ত হই। এ ধরনের সমস্যা শিশুদের বেশি হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা RTI কে দু'ভাবে চিহ্নিত করে থাকেন।

চিত্র ৫.৯ক : শ্বসননালির বিশেষ কোষ

(১) **উর্ধ্ব শ্বসননালির সংক্রমণ** (Upper respiratory tract infection) : এর ফলে সাধারণত নাক, কান, সাইনাস ও গলা আক্রান্ত হয়। উর্ধ্ব শ্বসননালির সংক্রমণের মধ্যে রয়েছে **সাধারণ ঠান্ডা, টনসিলাইটিস** (টনসিলের সংক্রমণ), **সাইনুসাইটিস** (সাইনাসের সংক্রমণ), **ল্যারিনজাইটিস** (ল্যারিংক্স বা স্বরযন্ত্রের সংক্রমণ), **ওটিটিস মিডিয়া** (মধ্যকর্ণের সংক্রমণ) ইত্যাদি। কাশি হলো এ ধরনের সংক্রমণের প্রধান লক্ষণ। এছাড়া মাথাব্যথা, নাক দিয়ে পানি ঝরা, হাঁচি, গলাব্যথা, পেশির ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।

(২) **নিম্ন শ্বসননালির সংক্রমণ** (Lower respiratory tract infection) : এ ধরনের সংক্রমণে শ্বাসনালি ও ফুসফুস আক্রান্ত হয়। নিম্ন শ্বসননালির সংক্রমণের মধ্যে রয়েছে **ফ্লু** (শ্বাসনালির সংক্রমণ), **ব্রঙ্কাইটিস** (শ্বাসনালির সংক্রমণ), নিউমোনিয়া (ফুসফুসের সংক্রমণ), **যক্ষ্মা** বা টিউবারকুলোসিস (ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ) ইত্যাদি। এ ধরনের সংক্রমণেরও প্রধান লক্ষণ হলো কাশি।

নিচে শ্বসননালির সমস্যাজনিত রোগের উদাহরণ হিসেবে সিলেবাসভুক্ত **সাইনুসাইটিস ও ওটিটিস মিডিয়া** সৃষ্ট রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার আলোচনা করা হলো–

সাইনুসাইটিস (Sinusitis) সাইনাস শব্দের শাব্দিক অর্থ **গহ্বর**। চিকিৎসাবিজ্ঞানে সাইনাস বলতে মুখমণ্ডলীয় অস্থির মধ্যস্থিত গহ্বরকে বোঝায়। মানুষের মুখমণ্ডলে চার জোড়া সাইনাস বা **প্যারান্যাসাল সাইনাস** (sinus or paranasal sinus) আছে। এগুলো হলো–

সাইনাসের নাম	প্রদাহের ধরন
১। ম্যাক্সিলারি সাইনাস (maxillary sinus)	ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে (গালের উপরে অবস্থিত) ব্যথা বা চাপ, যেমন– দাঁতব্যথা, মাথাব্যথা ইত্যাদি।
২। ফ্রন্টাল সাইনাস (frontal sinus)	ফ্রন্টাল সাইনাস গহ্বরে (চোখের উপরে অবস্থিত) ব্যথা বা চাপ, মাথাব্যথা।
৩। এথময়েড সাইনাস (ethmoid sinus)	দু'চোখের মাঝখানে (দু'চোখের মাঝখানে অবস্থিত) বা পেছনে ব্যথা, মাথাব্যথা।
৪। স্ফেনয়েড সাইনাস (sphenoid sinus)	চোখের পেছনে বা মাথার চূড়ায় (কপালের পাশে অবস্থিত) ব্যথা বা চাপ।

এসব সাইনাস মিউকাস পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে এবং পিচ্ছিল মিউকাস সৃষ্টির মাধ্যমে নাসিকা পথকে সিক্ত ও জীবাণুমুক্ত রাখে। এসব সাইনাস থেকে রস নিঃসৃত হয় এবং নাকের মাধ্যমেই তা বের হয়।

চিত্র ৫.৯খ : মুখমণ্ডলে সাইনাসসমূহ

কোনো কারণে ওই নালি বন্ধ হয়ে গেলে বা অন্য কোনো কারণে সাইনাসের ঝিল্লির প্রদাহ হলে সাইনুসাইটিসের সৃষ্টি হয়। কোনো কারণে (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যালার্জিজনিত প্রভৃতি) মুখমণ্ডলে বিদ্যমান সাইনাসগুলোর ঝিল্লিতে ঘা বা প্রদাহ হলে তাকে সাইনুসাইটিস বলে। সাইনুসাইটিস (sinusitis) হলো কোনো গহ্বরের প্রদাহ। একে রাইনোসাইনুসাইটিস (rhinosinusitis) ও বলা হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে সাইনুসাইটিসকে উর্ধ্ব শ্বসননালির সংক্রমণ (upper respiratory tract infection) বলে বিবেচনা করা হয়।

সাইনুসাইটিসের প্রকারভেদ (Types of sinusitis) : প্রদাহের স্থায়িত্ব ও লক্ষণের ওপর ভিত্তি করে সাইনুসাইটিস দুই প্রকার। যথা–

১। **অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস** (Acute sinusitis) : সাইনুসাইটিস আট সপ্তাহের (কারও মতে ৪-৮ সপ্তাহ) কম সময় থাকলে তাকে অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস বলে। এদের প্রধান লক্ষণের মধ্যে রয়েছে নাক দিয়ে পানি ঝরা, গরম বাতাস বের হওয়া এবং মুখমণ্ডলে ব্যথা অনুভব হওয়া।

২। **ক্রোনিক সাইনুসাইটিস** (Chronic sinusitis) : সাইনুসাইটিস ২-৩ মাসের অধিককাল থাকলে তাকে ক্রোনিক সাইনুসাইটিস বলে।

সাইনুসাইটিসের কারণ (Causes of sinusitis) (১) জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ : ভাইরাস (Respiratory syncytial virus -RSV, Metapneumo virus, Paraintlueza Virus), ব্যাকটেরিয়া (*Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Monaxella catarrhalis*), ছত্রাক (Aspergillus and Mucor Species) ইত্যাদি। (২) নাকের অ্যালার্জি : ধূমপান করলে বা ধূমপায়ীর আশপাশে থাকলে। (৩) নাকের ভেতর পলিপ (polyp) অর্থাৎ মাংসপিণ্ড সৃষ্টি হলে। (৪) নাকের হাড় বাঁকা থাকলে। দাঁতের ইনফেকশন থেকে। (৫) সাধারণ সর্দি-কাশির কারণে সাইনাসের নালিপথ বন্ধ হয়ে গেলে। (৬) অ্যালার্জিক হে ফিভার (hay fever), সিস্টিক ফাইব্রোসিস (cystic fibrosis) থাকলে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে। (৭) এছাড়া অপুষ্টি, রোগ সংক্রমণ ক্ষমতা কমে গেলে, ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ এবং পরিবেশ দূষণের কারণেও হতে পারে। (৮) যারা হাঁপানি সমস্যায় ভোগে তাদের দীর্ঘস্থায়ী সাইনুসাইটিস দেখা যায়। (৯) সাধারণত ঘরের পোকামাকড়, ধুলাবালি, পেস্ট, তেলাপোকাজনিত বায়ুবিদূষণ যেসব অ্যালার্জেন ধারণ করে তাদের প্রভাবে এ রোগের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। (১০) ইউস্টেশিয়ান নালির (eustachian tube) সামান্য অস্বাভাবিকতায় সাইনাস গহ্বর অবরুদ্ধ হয়ে এবং সংক্রমণের ফলে সাইনুসাইটিস হতে পারে।

সাইনুসাইটিসের লক্ষণ (Symptoms of sinusitis)

(১) প্রধান লক্ষণ হলো মাথাব্যথা। কারও ক্ষেত্রে পুরো মাথায় ব্যথা অথবা শুধু কপালে ব্যথা। মাথা হেলান বা নিচু করা যায় না, করলে তীব্র টনটন ব্যথা করে। সঙ্গে জ্বর থাকতে পারে। [কারও কারও মাথায় হাত দেওয়া যায় না, ব্যথা করে। চুল ধরলে কষ্ট অনুভব করে, মাথায় চিরুনি পর্যন্ত ব্যবহার করা খুব কষ্টকর হয়। সকাল বেলা যন্ত্রণা খুব বেশি থাকে। দিনের রৌদ্র বাড়তে থাকলে ব্যথা কিছুটা কম হয়।] (২) চোখের পেছনের দিকে ব্যথা। (৩) নাক বন্ধ হয়ে থাকা এবং নাক দিয়ে মাঝে মাঝে পানি ঝড়া। নিঃশ্বাসের সময় দুর্গন্ধ আসা বা ঘ্রাণশক্তিহীনতা, কাশি। (৪) খাবারের স্বাদ রুচি নষ্ট হয়ে যায়। (৫) দাঁতে ব্যথা, গলাভাঙা। (৬) ক্লান্তি, অবসন্নতার সাথে জ্বরও থাকতে পারে। মানসিক অবসাদ সৃষ্টি হয়। (৭) Para-nasal sinus X-ray (PNS X-ray) করলে সাইনাসগুলো খোলা দেখা যাবে (তরল বা পুঁজ জমে থাকার কারণে)। (৮) নাক থেকে ঘন তরল বের হতে থাকে। এটি সাধারণত হলদে বা সবুজ বর্ণের হয় এবং তাতে পুঁজ বা রক্ত থাকতে পারে।

সাইনুসাইটিসের কারণে জটিলতা (Complication due to sinusitis)

দীর্ঘদিন প্রদাহ থাকলে তা অন্যান্য অংশেরও ক্ষতি করতে পারে। বিশেষ করে চোখ ও মস্তিষ্ক বেশি আক্রান্ত হয়। খিচুনি (convulsion), চোখের অন্ধত্ব, মেনিনজাইটিস (মস্তিষ্কের পর্দা মেনিনজেসের প্রদাহ) এবং মস্তিষ্কে ক্ষত সৃষ্টি (brain abscess); এমনকি মস্তিষ্কে ফোঁড়াও (brain abceus) হতে পারে।

সাইনুসাইটিসের প্রতিকার (Treatment of sinusitis)

(১) লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক, কান, গলারোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। (২) চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধ, যেমন প্রদাহনাশক অ্যান্টিবায়োটিক, ব্যথানাশক অ্যানালজেসিক (analgesic); নাকের ড্রপ, সর্দির জন্য অ্যান্টিহিস্টামিন, জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল সেবন করতে হবে। (৩) এছাড়া বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে গরম পানিতে একখণ্ড কাপড় ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে, নাকের দু'পাশে এবং কপালে চেপে ধরা। (৪) প্রশ্বাসের সময় বাষ্প গ্রহণ (steam inhalation)। (৫) গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগানো যাবে না;

CamScanner

শরীর গরম থাকাকালীন ফ্রিজের ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া ঠিক নয়। (৬) নাসাপথ খোলা রাখার জন্য স্প্রে ব্যবহার। (৭) নাসাপথে পানি সঞ্চালন করা। (৮) প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা এবং নাকে লবণাক্ত পানি ছিটকে দিয়ে ধুয়ে নেওয়া। (৯) ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা। (১০) এটি জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী হলে সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে। (১১) সাইনাসসমূহ পরিষ্কার করতে হবে। এমনকি নাক সম্পর্কিত এবং সাইনাসের বিভিন্ন অপারেশনের ক্ষেত্রে এন্ডোস্কোপি করা যেতে পারে।

সাইনুসাইটিসের প্রতিরোধ(Prevention of sinusitis)

(১) শাকসবজি, ফলমূল অর্থাৎ পুষ্টিকর ও প্রচুর ভিটামিনযুক্ত খাবার বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা। (২) যেকোনো ধরনের অ্যালার্জির প্রভাব এড়িয়ে চলা। (৩) দাঁত নিয়মিত পরিষ্কার রাখা। (৪) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপান বর্জন করা। (৫) অতিরিক্ত পরিশ্রম পরিহার করা এবং ঠাণ্ডা, ধুলাবালি, বায়ুদূষণ পরিবেশে কাজ থেকে বিরত থাকা। (৬) নিয়মিত গোসল করা, ঘামমুক্ত পোশাক পরিধান করা। (vii) অতিরিক্ত ঠাণ্ডাজাতীয় খাবার পরিহার করা।

ওটিটিস মিডিয়া (Otitis Media)

কানের ভেতরে বা বাইরে যেকোনো অংশে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে **ওটিটিস** (chronic sinusitis) বলে। মধ্যকর্ণের সংক্রমণজনিত প্রদাহকে **ওটিটিস মিডিয়া** (otitis media) বা মধ্যকর্ণের সংক্রমণও বলে। কানের পর্দা ও অন্তঃকর্ণের মাঝে বিদ্যমান **ইউস্টেশিয়ান নালিতে** (eustachian tube) ওটিটিস মিডিয়া হয়। বয়স্কদের তুলনায় কম বয়সী শিশু ও কিশোরদের মধ্যে মধ্যকর্ণের প্রদাহ বা ওটিটিস মিডিয়া রোগ অধিক দেখা যায়। ওটিটিস মিডিয়াও উর্ধ্ব শ্বাসনালির সংক্রমণ বা ইনফেকশন। এ রোগ দ্বারা দীর্ঘদিনের সংক্রমণে কানের পর্দা ছিদ্র হয়ে যেতে পারে, এমনকি সাময়িক বা দীর্ঘস্থায়ী কানে না শোনা।

চিত্র ৫.১০। ক. স্বাভাবিক মধ্যকর্ণ ও খ. ওটিটিস মিডিয়া

ওটিটিস মিডিয়ার প্রকারভেদ (Types of otitis media): শিশুদের ওটিটিস মিডিয়া ৩ প্রকার। যথা–

রোগের নাম	স্থায়িত্বকাল	প্রদাহের ধরন
১। স্বল্পস্থায়ী বা একিউট ওটিটিস মিডিয়া (acute otitis media-AOM)। একে **তীব্র কর্ণপ্রদাহ** বলা হয়।	২ থেকে ৪ সপ্তাহের বেশি।	মধ্যকর্ণ পুঁজে ভরে যায় ও প্রচণ্ড ব্যথা হয়।
২। দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রোনিক ওটিটিস মিডিয়া (chronic otitis media-COM)। একে **তরল জমাট কর্ণপ্রদাহ** (otitis media with effusion) বলা হয়।	১ মাস বা তার বেশি।	মধ্যকর্ণে তরল ঘন আঠার মতো হয় ও শ্রবণে ব্যাঘাত ঘটে।
৩। অ্যাডহেসিভ ওটিটিস মিডিয়া (adhesive otitis media)	-	কানের পর্দা মধ্যকর্ণের কোনো স্থানে বা অস্থির সাথে আটকে গিয়ে রোগী বধির হতে পারে।

রোগের কারণ (Causes of disease)

(১) উর্ধ্ব শ্বাসনালির ইনফেকশন। (২) দীর্ঘস্থায়ী টনসিলের ইনফেকশন। (৩) মধ্যকর্ণের সঙ্গে নাকের সংযোগস্থল (ইউস্টেশিয়ান নালি) ফুলে গিয়ে বন্ধ হলে। (৪) শিশুদের ক্ষেত্রে **অ্যাডিনয়েড** (adenoid) ফুলে ওঠা। (৫) শিশুদের ঠাণ্ডা লাগলে এবং কানে সংক্রমণ হলে। (৬) ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাক দ্বারা সংক্রমণ। ভাইরাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– Respiratory syncytial virus (RSV), Mamps virus, Influenza virus; ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Pseudomonas aeruginosa* ইত্যাদি এবং ছত্রাকের মধ্যে *Candida* উল্লেখযোগ্য। (৭) অপুষ্টি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলেও মধ্যকর্ণের প্রদাহ হতে পারে।

শিশুদের বা বাচ্চাদের ওটিটিস মিডিয়া হওয়া প্রবণতা বেশি। কারণ–

(১) শিশুদের ইউস্টেশিয়ান টিউব ছোট। (২) শিশুদের মধ্যকর্ণ, ইউস্টেশিয়ান টিউব এবং নাসাগলবিল (nasopharynx) প্রায় একই লেভেলে অবস্থিত। যার ফলে শিশুদের বিছানায় শুইয়ে দুধ খাওয়ালে ওটিটিস মিডিয়া হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। (৩) যেসব শিশু ধূমপানযুক্ত ও বায়ুদূষণপূর্ণ এলাকায় বাস করে। (৪) ডে-কেয়ার সেন্টারগুলোর মতো জায়গায় যেখানে একসঙ্গে অনেক শিশু বেড়ে ওঠে। (৫) পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের কানে সংক্রমণ হলে শিশুদেরও কানের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

CamScanner

রোগের লক্ষণ (Symptoms of the diseases)

(১) কানে তীব্র ব্যথা; শিশুরা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কান্না করে। (২) শরীরে অত্যধিক জ্বর (high grade fever) থাকা। (৩) কানে অস্বস্তি ভাব; কান বন্ধ লাগা ও কানে কম শোনা। (৪) কান দিয়ে পুঁজ পড়া অথবা পানি পড়া। (৫) মনোযোগ কমে যাওয়া, মাথা ঝিমঝিম করা। (৬) মধ্যকর্ণে জলীয় পদার্থ জমার জন্য মাথা ঘুরানি হতে পারে। (৭) ভাইরাসঘটিত ওটিটিসের ফলে টিম্পেনিক পর্দার বাইরের পাশে ফোসকা সৃষ্টি হয়। একে **বুলাস মাইরিঙ্গিটিস** (bullous myringitis) বলে। (৮) কান চুলকান ও জোরে কান টানা এবং ঘুমে ব্যাঘাত। (৯) প্রচণ্ড মাথাব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য, কাশি ও নাক দিয়ে পানি ঝরা। (১০) কান ভোঁ ভোঁ করা বা গুণ গুণ ধ্বনি শোনা। (১১) কানের পর্দা ফেটে গেলে পিনা গড়িয়ে তরল পদার্থ নির্গমন। (১২) দেহের ভারসাম্য রক্ষায় সমস্যা এবং শ্রবণ সমস্যা।

ওটিটিস মিডিয়ার কারণে জটিলতা (Complication due to otitis media)

সাধারণত কানের সংক্রমণজনিত জটিলতা কম পরিলক্ষিত হয়। তবে সংক্রমণের মাত্রা বেড়ে গেলে প্রধানত দু'ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে। যথা- (১) **ম্যাস্টোডাইটিস** (Mastoiditis) : কানের নিচে বিদ্যমান ম্যাস্টয়ড অস্থির সংক্রমণ এবং (২) **মেনিনজাইটিস** (Meningitis) : মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের পর্দা মেনিনজেসের প্রদাহ।

ওটিটিস মিডিয়ার প্রতিকার (Treatment of otitis media)

(১) প্রাথমিক অবস্থায় কান পরিষ্কার রাখা। কানে তুলাজাতীয় পদার্থ দিয়ে বন্ধ করে গোসল করা। শিশুদের কোলে নিয়ে দুধ খাওয়ানো। (২) যদি লক্ষণগুলো একদিনের বেশি থাকে অথবা কান দিয়ে পুঁজ পড়া বন্ধ না হয় তাহলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। (৩) তারপর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইনফেকশনের জন্য **অ্যান্টিবায়োটিক** (antibiotic), ব্যথানাশক ওষুধ **অ্যানালজেসিক** (analgesic) এবং জ্বরের উপদ্রব কমানোর জন্য **প্যারাসিটামল** (paracetamol) সেবন; কানে ড্রপ দেওয়া এবং কানের অপারেশন করা। (৪) ঊর্ধ্ব শ্বসননালির ইনফেকশন নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। (৫) টনসিল ও এডিনয়েড ফুলে গেলে তা অপারেশন করে ফেলে দিতে হবে। (৬) অ্যালার্জি থাকলে **অ্যান্টি-হিস্টামিন** (anti-histamine) খেতে হবে। (৭) চিকিৎসকরা এ রোগে ঘনঘন আক্রান্ত রোগীদের **টিমপেনোস্টোমি টিউব** (tympanostomy tube) দ্বারা চিকিৎসা করে থাকেন।

ওটিটিস মিডিয়ার প্রতিরোধ (Prevention of otitis media)

(১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে হবে। (২) শিশুদের বিছানায় শুইয়ে দুধ খাওয়ানো যাবে না। (৩) শিশুদের ধোঁয়ামুক্ত পরিবেশে রাখতে হবে। (৪) নিজের বাচ্চাকে অসুস্থ বাচ্চাদের থেকে দূরে রাখতে হবে। (৫) বাচ্চাকে ছয় মাস পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। (৬) বাচ্চাকে নিয়মিত নিউমোনিয়া ও মেনিনজাইটিসের টিকা দিতে হবে। (৭) কোনো অবস্থাতেই কানে যেন পানি না ঢোকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

❑ **কাজ :** (i) সাইনাসের গহ্বরগুলোর নাম, অবস্থান ও প্রদাহ সম্পর্কে লেখ। (ii) সাইনুসাইটিস থেকে কীভাবে মুক্ত থাকা যায়– ব্যাখ্যা কর। (iii) শ্বাসনালিতে সংক্রমণ হলে যে সমস্যা দেখা যায় তা প্রতিকারের উপায় বর্ণনা কর। (iv) সাইনুসাইটিস রোগের জটিলতাসমূহ ব্যাখ্যা কর।

৫.৬ একজন অধূমপায়ী ও একজন ধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের তুলনা
(Comparison Between the X-ray Film of Smoker and Nonsmoker)

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য, বিশেষ করে ফুসফুসের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ধূমপানের কারণে প্রতি বছর পৃথিবীতে লাখ লাখ মানুষের অকালমৃত্যু ঘটে। একটি সিগারেটের শলায় প্রায় ৪ হাজার বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ থাকে। ধূমপানের ফলে এগুলো দেহের ভেতরে, বিশেষ করে ফুসফুসে প্রবেশ করে দেহকে অসুস্থ করা শুরু করে। সিগারেটের ধোঁয়ায় যেসব ক্ষতিকর উপাদান থাকে তাদের মধ্যে নিকোটিন, টার, কার্বন মনোক্সাইড (CO), আর্সেনিক, অ্যামোনিয়া, মিথেন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড ইত্যাদি প্রধান। একজন অধূমপায়ী ও একজন ধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রে (X-ray) চিত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়।

১। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে একটি সামঞ্জস্য ফুসফুস ক্ষেত্র দেখা যায় অর্থাৎ আকৃতিগতভাবে ফুসফুস স্বাভাবিক থাকে। আর একজন ধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে একটি অসামঞ্জস্য ফুসফুস ক্ষেত্র দেখা যায়। অর্থাৎ সার্বিকভাবে ফুসফুসের আকার বৃদ্ধি পায়।

২। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রের কালো দাগ ও সাদা দাগের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদন দেখা যায়। আর ধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রের ক্ষেত্রে কালো দাগগুলো অস্পষ্ট হয়ে যায়।

CamScanner

৩। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে ফুসফুস ও অ্যালভিওলাইয়ের প্রাচীরের ক্ষয় লক্ষণীয় নয়; কিন্তু ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে ক্ষয় লক্ষণীয়।

৪। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে অ্যালভিওলাইয়ে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায়। অন্যদিকে ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে অ্যালভিওলাইয়ে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায় না।

৫। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে অ্যালভিওলাস প্রাচীরের সিলিয়াগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়। কিন্তু ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে অ্যালভিওলাস প্রাচীরের সিলিয়াগুলো বিনষ্ট অবস্থায় দেখা যায়।

৬। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে **মধ্যকা** স্বাভাবিক দেখা যায়; কিন্তু ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে **মধ্যকা** বিস্তৃত থাকে।

৭। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে এমফাইসেমার চিহ্ন দেখা যায় না। অপরপক্ষে ধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে এমফাইসেমার চিহ্ন দেখা যায়। সিগারেটের ধোঁয়ায় অ্যালভিওলাসের আয়তন বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যালভিওলাস ফেটে গিয়ে ফুসফুসে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করে, একে **এমফাইসেমা** (emphysema) বলে।

(ক) (খ)

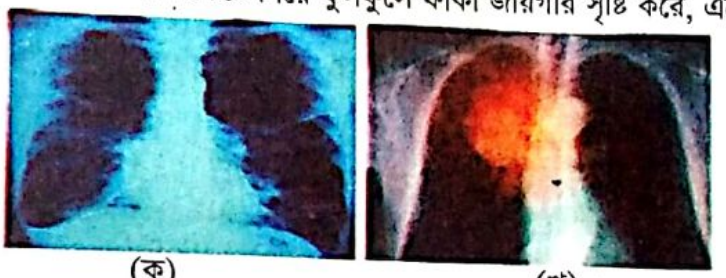

চিত্র ৫.১১ক : (ক) একজন অধূমপায়ী ও (খ) একজন ধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রে চিত্র

চিত্র ৫.১১খ : (গ) স্বাভাবিক এবং (ঘ) এমফাইসেমা রোগীর ফুসফুস

৮। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের প্রচ্ছায়া সমানুপাতিক ও স্বাভাবিক দেখা যায়; কিন্তু ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের প্রচ্ছায়া ফুসফুসের তুলনায় ছোট দেখা যায়।

৯। অধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষের চিহ্ন দেখা যায় না। অন্যদিকে ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে এরূপ চিত্র দেখা যায়।

১০। ধূমপায়ীদের ফুসফুসের X-ray চিত্রে অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউমার উপবৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যায়। অধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না।

১১। ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে TB রোগীর বুকের X-ray তে ফাঁকা জায়গা দেখা যায়, যা অধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

অধূমপায়ী ও ধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের তুলনা

তুলনীয় বিষয়	অধূমপায়ীর ফুসফুসের এক্স-রে চিত্র	ধূমপায়ীর ফুসফুসের এক্স-রে চিত্র
১। আকার	আকৃতিগতভাবে ফুসফুস স্বাভাবিক দেখা যায়।	সার্বিকভাবে ফুসফুসের আকার বড় দেখায়।
২। মধ্যকা	স্বাভাবিক দেখা যায়।	বিস্তৃত থাকে।
৩। সাদা-কালো দাগ	সাদা ও কালো দাগের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদন দেখা যায়। এটি সাধারণত কালো দেখায়।	কালো দাগগুলো অস্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ কোথাও কোথাও সাদাটে বা সাদা দেখায়।
৪। ফুসফুস ও অ্যালভিওলাসের প্রাচীর	প্রাচীরের ক্ষয় লক্ষণীয় নয়।	প্রাচীরের ক্ষয় লক্ষণীয়।
৫। এমফাইসেমা	এমফাইসেমার চিহ্ন দেখা যায় না।	চিহ্ন দেখা যায়।
৬। ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের প্রচ্ছায়া	সমানুপাতিক ও স্বাভাবিক দেখা যায়।	হৃৎপিণ্ডের প্রচ্ছায়া ফুসফুসের তুলনায় ছোট দেখা যায়।
৭। টিউমার	টিউমার উপবৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যায় না।	দেখা যায়।
৮। স্বচ্ছতা	অ্যালভিওলাইয়ে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায়।	অ্যালভিওলাইয়ে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায় না।
৯। ক্যান্সার	ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষের চিহ্ন দেখা যায় না।	চিহ্ন দেখা যায়।
১০। পানি জমা	ফুসফুসে কোনো পানি জমা (Pleural effusion) শনাক্ত করা যাবে না।	ফুসফুসে পানি জমা শনাক্ত করা যাবে।

❑ **কাজ :** "ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর" শিরোনামে ধূমপানে সৃষ্ট জটিলতাসমূহ চিহ্নিত করে বিশ্ব ধূমপানমুক্ত দিবস ও বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস (৩১ মে) উপলক্ষে সহপাঠীদের নিয়ে জনসচেতনতামূলক একটি তথ্যবহুল পোস্টার তৈরি করে কলেজ বোর্ডে স্থাপন কর।

(এক্ষেত্রে নিম্নের তথ্যগুলো সহযোগিতা করবে)

CamScanner

ধূমপান মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

WHO (World Health Organization)-এর মতে বিংশ শতাব্দীতে সারাবিশ্বে প্রায় ১০ কোটি লোক তামাক ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটেছে। বর্তমান বিশ্বে আনুমানিক ১২৫ কোটি লোক ধূমপায়ী। ধূমপানে কোনো উপকারিতা নেই অথচ বিশ্বে প্রতিদিন এর পেছনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে যা দিয়ে বহু বুভুক্ষু মানুষের অন্নসংস্থান হতো। ধূমপান পরিবেশেরও দূষণ ঘটায় এবং অধূমপায়ীদের শ্বাস গ্রহণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এটি মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বায়ুদূষণ ও শ্বসন জটিলতা

যখন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় কিংবা মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেষ্টক বাতাসে বিভিন্ন গ্যাসের ঘনীভবন ও কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ স্বাভাবিক বা সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেড়ে যায়, তখন এ অবস্থাকে বায়ুদূষণ বলে। প্রধানত জ্বালানি পোড়ানোর উৎস থেকে (পরিবহন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কলকারখানা, তাপযন্ত্র প্রভৃতি) এবং কিছুটা কীটনাশক ব্যবহার, কৃষিকর্মের ফলে ধুলা বৃষ্টি, ক্ষেতে শস্য উদ্ভিদের অংশ পোড়ানোর, কুয়াশা ও ধোঁয়াশা, সজীব কণা (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাকের রেণু, পরাগরেণু), ধূমপানে সৃষ্ট ধোঁয়া, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও রঞ্জনরশ্মি, সৌর অবলোহিত (ইনফ্রারেড) রশ্মি থেকে বায়ু দূষকের উৎপত্তি হয়।

বায়ুদূষণের ফলে সংঘটিতব্য শ্বসন জটিলতাজনিত কিছু রোগ।

১। **সর্দি-কাশি** : বায়ুতে অস্বাভাবিক ধুলাবালি থাকলে সর্দি-কাশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২। **নিউমোনিয়া** : বায়ুর মাধ্যমে নিউমোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ায় (*Diplococcus pneumoniae*) আক্রান্ত হলে নিউমোনিয়া রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, জ্বর নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণ।

৩। **যক্ষ্মা** : বায়ু দূষিত হলে যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। টিউবারকিউলা ব্যাকটেরিয়ায় (*Mycobacterium tuberculosis*) আক্রান্ত হলে যক্ষ্মা হয়। এ মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে শিশুদের বি.সি.জি টিকা অবশ্যই দিতে হবে।

৪। **অ্যাজমা** : এ রোগ কোনো জীবাণু আক্রান্ত রোগ নয়। ধুলাবালি অথবা কোনো নির্দিষ্ট খাবার গ্রহণে এ রোগ হতে দেখা যায়। এ রোগের লক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট। শ্বাসনালির গাত্র সংকুচিত হওয়ার ফলে বায়ু-কোষগুলো প্রয়োজনমতো অক্সিজেন না পেয়ে দারুণ শ্বাসকষ্ট অনুভব করে।

৫। **প্লুরোসি** : প্রতিটি ফুসফুস প্লুরা নামক ঝিল্লিতে আবৃত থাকে। এ ঝিল্লি আক্রান্ত হয়ে স্ফীত হয় এবং প্লুরার গহ্বরে লসিকা জমে। ফলে অত্যধিক ব্যথায় শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটে। ফুসফুসের চারদিকে এ তরল পুঁজ ফুসফুসের নড়াচড়া সীমিত করে দেয়। প্লুরোসিসে জ্বর হয়। পেনিসিলিন ওষুধ প্রয়োগে এর উপশম হয়।

৬। **ব্রঙ্কাইটিস** : শ্বাসনালির ভেতরে আবৃত ঝিল্লির প্রদাহের কারণে ব্রঙ্কাইটিস রোগ হয়। জ্বর, খুসখুসে কাশি ও শ্বাসকষ্ট এ রোগের লক্ষণ। স্যাঁতসেঁতে ধূলিকণা মিশ্রিত আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগলে মানুষ ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়।

ধূমপানজনিত শ্বসন জটিলতা

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য, বিশেষ করে ফুসফুসের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ধূমপানে সৃষ্ট ধোঁয়াতে প্রায় ৫০০ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে। ধূমপানে যেসব ক্ষতিকর উপাদান থাকে তার মধ্যে **নিকোটিন**, **টার** (tar) এবং **CO** প্রধান। নিকোটিন উত্তেজক, বিষাক্ত ও নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু। ধূমপানের কয়েকটি ক্ষতিকর দিক নিম্নরূপ–

১। ধূমপানের ধোঁয়ায় অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে যে ক্ষতি হয় তার ফলে অ্যালভিওলাস আয়তনে বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো স্থান ফেটে গিয়ে ফুসফুসে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করে। এ অবস্থাকে **এমফাইসেমা** (emphysema) বলে। এ রোগে ফুসফুসের শ্বসন অঞ্চল হ্রাস পায় এবং ফুসফুসের কোষের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়। এতে শ্বাস-প্রশ্বাসে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়।

২। সিগারেটের ধোঁয়ায় বিদ্যমান বিষাক্ত নিকোটিন ও টার ফুসফুসে **ক্যান্সার** সৃষ্টি করে। ৯০% ফুসফুসীয় ক্যান্সার ধূমপানের কারণে হয় বলে মনে করা হয়। যাদের গ্যাস্ট্রিক আলসার রয়েছে তারা ধূমপান করলে এ রোগ আরও বেড়ে যায়। এছাড়াও ধোঁয়ার CO শ্বাসনালিতে **ব্রঙ্কাইটিস** (bronchities) সৃষ্টি করে। ব্রঙ্কাইটিস হলে ট্রাকিয়া ও ব্রঙ্কাসের সিলিয়া অবশ হয়ে পড়ে। সাধারণত সিলিয়া অনবরত দুলতে থাকে। এতে ট্রাকিয়া বা ফুসফুস, ধুলাবালি, রোগজীবাণুমুক্ত থাকতে সহায়ক হয়; কিন্তু সিলিয়া অবশ হয়ে গেলে ট্রাকিয়ায় মিউকাস জমে প্রদাহের সৃষ্টি করে।

৩। CO রক্তের O_2 পরিবহনের ক্ষমতা কমায় এবং ধমনির ভেতরে কোলেস্টেরল জমতে সাহায্য করে। ফলে ধমনি গহ্বর সংকীর্ণ হয়ে বা বন্ধ হয়ে O_2 সরবরাহ কমিয়ে দেয়। এতে **হার্ট অ্যাটাক** (heart attack) এবং উচ্চ রক্তচাপসহ **স্ট্রোক** (stroke) করার প্রবণতা বেড়ে যায়।

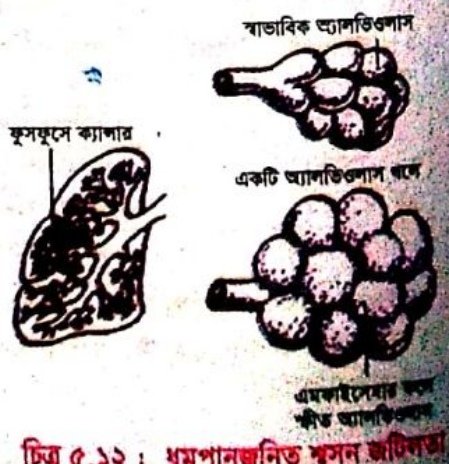

চিত্র ৫.১২ : ধূমপানজনিত শ্বসন জটিলতা

৪। ধূমপায়ী নারীদের বন্ধ্যা হওয়ার এবং সন্তান বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
৫। নিয়মিত ধূমপান গলা ও অন্ননালিতে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। মুখ, গলা ও খাদ্যনালিতে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি ধূমপায়ীর জন্য অধূমপায়ীর চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি।
৬। ধূমপান পরিবেশ দূষণ ঘটায়, ফলে সিগারেটের ধোঁয়ায় একই কক্ষে অবস্থানরত অধূমপায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৭। দীর্ঘস্থায়ী ধূমপায়ীদের ফুসফুসে COPD (Chronic obstructive Disease) রোগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে শ্লেষ্মা নিঃসরণকারী গ্রন্থিগুলো বড় হয়ে অধিক শ্লেষ্মা তৈরি করে এ কাশি হয়।

ধূমপান ছাড়ার কয়েকটি উপায় (Some way of leave from smoking)

অনেক মানুষ আছে যারা ধূমপান ছাড়তে চাইলেও শেষমেশ ব্যর্থ হয়। এর প্রধান কারণ হলো মানসিক দৃঢ়তার অভাব। চেষ্টা করেও যখন ধূমপান ছাড়া সম্ভব হয় না, তখন মানসিক যন্ত্রণায় হতাশ হয়ে পড়ে অনেকে। চেষ্টা করেও যারা ধূমপান ছাড়তে পারে না তাদের জন্য কয়েকটি উপায় বের করেছেন বিশেষজ্ঞরা। মানসিক দৃঢ়তা ও নিচের পন্থাগুলো অনুসরণ করলে হয়তো ধূমপান ত্যাগ করাটা খুব সহজ হয়ে যাবে ধূমপায়ীদের জন্য।

১। **পরিবার ও বন্ধুদের সমর্থন** : ধূমপান থেকে মুক্তি পেতে পরিবার ও বন্ধুদের কাছ থেকে উৎসাহ ও সমর্থন প্রয়োজন। এর ফলেনিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।

২। **ধূমপান সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলা** : আশপাশে থাকা ধূমপান সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র যেমন– লাইটার, ছাইদানি, সিগারেটের পুরনো প্যাকেট প্রভৃতি সরিয়ে ফেলতে হবে।

৩। **গভীর শ্বাস** : মনকে শান্ত ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি থেকে বের করে আনতে গভীরভাবে শ্বাস নেওয়া বা মেডিটেশন করা শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

৪। **প্রচুর পানি পান** : প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান শরীরের নিকোটিন ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বের করে দেয়।

৫। **ব্যায়াম** : নিয়মিত ব্যায়াম পারে ধূমপান ছাড়ার ফলে যেসব প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় তার বিরুদ্ধে লড়তে।

৬। **ইতিবাচক মনোভাব** : আত্মনিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হবে। প্রতিদিন নিজের দৃঢ় প্রত্যয় সম্পর্কে মনে করতে হবে।

❑ **কাজ** : (i) ধূমপানের পরোক্ষ ক্ষতি অনেক বেশি– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। (ii) ধূমপানের ফলে ফুসফুসের গঠনে কিছু ভিন্নতা দেখা যায়– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। (iii) ধূমপান মানুষের জীবনে কী ধরনের জটিলতা ও পরিণতি ডেকে আনতে পারে বলে তুমি মনে কর।

৫.৭ কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া (Process of Artificial Breathing)

পানিতে ডোবা, ইলেকট্রিক শক খাওয়া, কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়া, ভূমিকম্প, দেহে প্রচণ্ড আঘাত প্রভৃতি সংকটময় মুহূর্তে জীবন রক্ষার প্রয়োজনে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আর এজন্য CPR বা **কার্ডিওপালমোনারি রিসাসসিটেশন** (Cardiopulmonary Resuscitation) বা হৃৎ-ফুসফুসের পুনঃজাগরণ চিকিৎসা পদ্ধতি সহজতর। বিভিন্ন দুর্ঘটনায় বা প্রাকৃতিক কারণে কোনো ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে এ পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। যে ব্যক্তি CPR দেবেন তাকে **উদ্ধারকর্মী** বা **রেসকিওর** (rescur) বলা হয়। এ পদ্ধতির সহায়তাকারী বা রেসকিওর হিসেবে বিভিন্ন লোককে (যেমন– ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, সমাজকর্মী, পুলিশ, দমকল বাহিনী, সেনাসদস্য ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের উদ্দেশ্য

১। যখন কোনো ব্যক্তির নিজ চেষ্টায় শ্বাস গ্রহণে সক্ষম হয় না কিংবা শ্বাস গ্রহণে তাকে সাহায্য করার প্রয়োজন হয় তখন কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনের ব্যবস্থা করা হয়।

২। ফুসফুস ও রক্তসংবহনে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটিয়ে শ্বাসকেন্দ্র ও হৃৎপিণ্ডের প্রাণশক্তি বজায় রাখা।

৩। ফুসফুসকে পর্যায়ক্রমে বায়ু স্ফীত ও সংকুচিত করে শ্বাসকেন্দ্রকে উদ্দীপিত করা, যাতে সে তার নিজস্ব স্বাভাবিক সক্রিয়তা ফিরে পেতে পারে।

৪। এই পদ্ধতি প্রয়োগে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে অক্সিজেন পৌঁছানোর মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে সক্রিয় করা।

৫। তাৎক্ষণিকভাবে রক্তে অক্সিজেন পৌঁছানোর মাধ্যমে মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হতে না দেওয়া।

অতএব, কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া এমন হওয়া উচিত যাতে– (i) ফুসফুসে বায়ুচলন পর্যাপ্ত হয়; (ii) শ্বাসনালি যথাসম্ভব উন্মুক্ত থাকে ও (iii) ফুসফুসে বায়ুচলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরন

১। **মুখ থেকে মুখে শ্বাস-প্রশ্বাস** : রোগীর নাক বন্ধ করে তার মুখকে নিজের মুখের ভেতর দিয়ে জোরে জোরে নিজের শ্বাস রোগীর ফুসফুসে প্রবেশ করানো।

২। **মুখ থেকে নাকে শ্বাস-প্রশ্বাস** : রোগীর মুখ বন্ধ করে ধরে তার নাক নিজের মুখের ভেতর নিয়ে জোরে জোরে নিজের শ্বাস রোগীর ফুসফুসে প্রবেশ করানো।

CamScanner

৩। **মুখ থেকে মাস্ক শ্বাস-প্রশ্বাস :** রোগীর নাক বা মুখের উপরে এক টুকরো কাপড় রেখে কাপড়ের উপর দিয়ে জোরে জোরে নিজের শ্বাস রোগীর ফুসফুসে প্রবেশ করানো।

৪। **মুখ থেকে কৃত্রিম শ্বাসনালিতে (স্টোমা) শ্বাস-প্রশ্বাস :** রোগীর কৃত্রিম শ্বাসনল লাগানো থাকা অবস্থায় তার সাহায্যে মুখ দিয়ে কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখা।

৫। **ভেন্টিলেটর ব্যবহার :** এসকল পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ সম্ভব না হলে সহজে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দেওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা **ভেন্টিলেটর** (mechanical ventilator) ব্যবহার করা যায়।

মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস (Artificial Respiration by Mouth to Mouth)

হস্তকৃত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে এই পদ্ধতি উৎকৃষ্ট কারণ। এ পদ্ধতিতে সর্বক্ষেত্রে ফুসফুসীয় বায়ুচলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। শিশু ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস পদ্ধতি নিম্নরূপ–

শিশুদের ক্ষেত্রে

১। প্রথমে শিশুকে শক্ত সমতল জায়গায় শোয়াতে হবে।

২। এরপর মুখ ও গলা ভালো করে লক্ষ করতে হবে যেন এর মধ্যে কোনো বস্তু আছে কি-না এবং বায়ু চলাচলের রাস্তা পরিষ্কার কি-না। যদি কোনো বস্তু থাকে তাহলে তা আঙুলের সাহায্যে উঠিয়ে ফেলতে হবে এবং যদি বমি হয় সেটা দুই আঙুলের সাহায্যে পরিষ্কার করতে হবে।

৩। বায়ু চলাচলের রাস্তা ঠিক রাখতে মাথা পেছনে হালকা হেলিয়ে নিতে হবে।

৪। নিজের মুখ শক্তভাবে শিশুর নাক এবং মুখ চেপে ধরতে হবে। দ্রুত দুইবার অল্প অল্প বাতাস শিশুর ফুসফুসে প্রেরণ করা এবং লক্ষ রাখা বুক উপরের দিকে ফুলে উঠছে কি-না; জোরে ফুঁ না দেওয়া কারণ এতে করে ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৫। মুখ উঠিয়ে নেওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়েছে কি-না লক্ষ রাখা। শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ খেয়াল রাখা। যদি শিশু ঠিকমতো শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে ব্যর্থ হয় তাহলে এ প্রক্রিয়াটি আবার শুরু করা। যতক্ষণ পর্যন্ত না রোগী নিজ থেকে শ্বাস নিতে পারছে প্রতি মিনিটে ২০ বার ফুঁ দেওয়া যেতে পারে। এ প্রক্রিয়া ঘণ্টাকাল স্থায়ী হতে পারে।

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে

১। রোগীকে প্রথমে চিৎ করে শোয়ানো হয় এবং রোগীর গ্রীবা ও বক্ষের কাপড় ঢিলা করে দিতে হয়।

২। এর পর নিচের চোয়ালকে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর দ্বারা চেপে ধরে অন্য বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর সাহায্যে রোগীর নাসারন্ধ্র চেপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেন মুখের বাতাস নাক দিয়ে বের না হয়ে যায়।

চিত্র ৫.১৩ : কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া (মুখ হতে মুখের সাহায্যে)

৩। এরপর রোগীর মুখে মুখ লাগিয়ে স্বাভাবিক প্রবাহী বায়ুর দ্বিগুণ পরিমাণ বায়ুকে জোর করে তার ফুসফুসে প্রবেশ করানো হয়। ফলে ফুসফুস ও বক্ষ প্রসারিত হয়।

৪। এর পরই মুখ সরিয়ে নিয়ে পুনরায় একইভাবে জোর করে রোগীর দেহে বায়ু প্রবেশ করানো হয়। মিনিটে ১৪-২৮ বার এই প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা দরকার। রোগীর পাল্‌স কিংবা হার্টবিট না আসা পর্যন্ত এ প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যেতে হবে।

৫। এ প্রক্রিয়া চালানোর ফলে যদি দেখা যায় রোগীর বুক নিজ থেকেই উঠানামা করছে তখন তা বন্ধ করে দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তা না হলে যতক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসক, অক্সিজেন নল, অক্সিজেন ব্যাগ, সিলিন্ডার ও অ্যাম্বুলেন্স না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবে সিপিআর (CPR) চালিয়ে যেতে হবে।

বিশেষ মুখ-মুখে শ্বাস প্রশ্বাস

শিশু-কিশোর-যুবক বয়সী লোক অনেক সময় পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে।যেকোনো কারণেই যদি কোনো ব্যক্তি ডুবে যায় তাহলে উদ্ধারকারী ব্যক্তি ডুবন্ত ব্যক্তিকে কূলের কাছে টেনে এনে একটু দাঁড়ানোর জায়গা পেলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে মুখে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া শুরু করে দিতে হবে (চিত্র ৫.১২-ঙ)।